# চতুর্থ অধ্যায়

## আঙ্গিক প্রকরণ

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষে এক নতুন রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঐ সময় বাংলা ও বাঙালীর জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যে এক নতুন পরিবর্তনের জোয়াড় আসে, তার চরিত্র সর্বভারতীয় পালাবদলের তুলনায় ভিন্নতর।

চল্লিশের দশকের শেষদিকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণ ছিল, এ দেশের মাটিতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য হওয়ার সুবাদে বাংলার জনজীবনে স্বাধীনতা অর্জনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তো ছিলোই, উপরন্তু যোগ হয়েছিল অন্য দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা, বঙ্গভঙ্গ এবং পঞ্চাশের মহা-মন্বন্তর। এই অতিরিক্ত ঘটনা দুটি বাংলা এবং বাঙালীর জীবনের মূলকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল এক নতুনতর এবং অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়ে। এই অস্থিরতায় যৌথ পরিবার ভাঙতে শুরু করে; সজত্ন লালিত মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে জাগতিক সুখ করায়ত্ত করার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং গ্রাম-বাংলার মানুষ জীবীকার সন্ধানে শহরমুখী হতে শুরু করে। দিশাহীন বাঙালী তার অস্তিত্বরক্ষার কঠিন সংগ্রামে সামিল হয়।

বাঙালী জীবনের এই অস্থিরতা স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ের সাহিত্যচর্চাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। নতুন লেখকদের সাহিত্যসৃষ্টিতেও ফুটে ওঠে সমাজজীবনের ভাঙ-গড়ার ছবি। কথাসাহিত্যে বিষয় নির্বাচণ, প্রকাশভঙ্গী ও পরিবেশ নির্মাণেও পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা। যে কয়েকজন লেখকের ছোটগল্পে এই অশান্ত দিনের অস্থির জীবনচর্চার স্পষ্ট প্রতিফলন বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করেছে, সুবোধ ঘোষ তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য।

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের আঙ্গিক ও প্রকরণ সম্পর্কে আলোচনা আমরা প্রাইমা পাবলিকেশনের পাঁচখন্ডে প্রকাশিত সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ-র ১৫৭ টি গল্পের মধ্যেই প্রাথমিকভাবে সীমাবদ্ধ রাখছি। গল্প-কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক গল্পের আয়তন। ১৫৭টি গল্পের মধ্যে একের থেকে পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে আটটি গল্প, ছয় থেকে ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫১টি গল্প, ১১ থেকে ১৫ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫৭টি, ১৬-২০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৩২টি গল্প, ২১-২৫ পৃষ্ঠার মধ্যে ছয়টি, ২৬-৩০ পৃষ্ঠার মধ্যে দুটি এবং সর্বাধিক ৩১ পৃষ্ঠার একটি গল্প। দ্বিতীয় খন্ডের অব্যায়ামেষু এবং চতুর্থ খন্ডের সিদ্ধপুরুষ গল্পদুটি মাত্র দেড় পৃষ্ঠার ক্ষুদ্রতম ছোটগল্প, অন্যদিকে প্রথম খন্ডের প্রথম গল্প 'অলীক' ৩১ পৃষ্ঠার সর্ববৃহৎ পরিসরের ছোটগল্প। সুবোধ ঘোষের প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' সাত-সাড়ে সাত পৃষ্ঠার। আয়তনের বিচারে দেখা যায় ছয় থেকে ১৫ পৃষ্ঠার মধ্যেই দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি ১০৮ টি গল্প রচিত হয়েছে। এই বিভাগের মধ্যেই রয়েছে বহু প্রশংসিত অযান্ত্রিক, ফসিল, একতীর্থা, শুক্লাভিসার, ভাট তিলকরায়, বৈরনির্যাতন, সুন্দরম, তিন অধ্যায়, শুক্লানবমী, পরশুরামের কুঠার, কৌন্তেয় প্রভৃতি গল্পগুলো।

সুবোধ ঘোষের গল্পের আয়তনের এই তথ্যগুলোকে সম্মুখে রেখে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানোর পূর্বে একটি বিষয় বিবেচনা করা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে যে লেখক আনন্দবাজারে চাকরী করার সুবাদে এবং দীর্ঘদিন নিয়মিত সম্পাদকীয় রচনা করার জন্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে রচনা সম্পূর্ণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই পরিমিত লেখার অভ্যাসের প্রভাব ছোটগল্পে পড়েনি।

কোন বিষয় বস্তুকে ছোটগল্পে রূপ দিতে গিয়ে যখন যতটুক পরিসরের প্রয়োজন হয়েছে, তখন ততটুকু পরিসরই ব্যবহার করেছেন সুবোধবাবু। অর্থাৎ, গল্পের প্রয়োজনেই গল্পের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে, পত্রিকার মত নির্দিষ্ট পরিসরের কথা মাথায় রেখে তিনি গল্প রচনা করেন নি।

শুধু তাই নয়। একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক হওয়ার কারণে সুবোধ ঘোষের প্রতিটি লেখার পেছনেই এক সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল, গড়ে উঠেছিল অসাধরণ পরিমিতিবোধ। এ প্রসঙ্গে সুবোধ ঘোষকে লেখা সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি চিঠির অংশবিশেষ উল্লেখ করছি।

> ''প্রিয়বরেষু,
> এবারের পূজার 'দেশে' আপনার গল্পটি পড়ে বড় আনন্দ পেয়েছি আর মনে মনে আপনাকে বহুৎ শাবাশী দিয়েছি। ...
> ...আবার নিবেদন করি, বড় পাকা হাতে লিখেছেন গল্পটি। এদিক ওদিক একটু বাড়াবাড়ি হলেই সব গুড় মাটি হয়ে যেত। অতিশয় কেরদানির সঙ্গে আপনি এ টাইট-রোপ ডানসিংটি দেখিয়েছেন।...
>
> ভবদীয়
> মুজতবা আলি।[১]

সুবোধ ঘোষের রচনাশৈলীর একটি বিশেষত্ব তাঁর ভাষার সাংকেতিকতা। ছোটগল্পগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রে তাঁর এই সাংকেতিকতা কতটা ফলপ্রসু হয়েছে সে প্রসঙ্গে সামান্য আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এই আলোচনার প্রারম্ভে বলা প্রয়োজন যে তাঁর ১৫৭টি গল্পের মধ্যে একটি মাত্র শব্দ ব্যবহার করে ১০০ টি গল্পের নামকরণ করা হয়েছে, ৪০টি গল্পের নামকরণ হয়েছে দুটি শব্দ ব্যবহার করে এবং বাদবাকী ১৭টির নামকরণ হয়েছে প্রধানত তিনটি, দু-একটি ক্ষেত্রে চারটি শব্দ যোগে। তিন এবং ততোধিক শব্দের এই ১৭টি গল্পের নামগুলো অধিকাংশই কাব্যিক। যেমন দেবতারে প্রিয় করি, আগুন আমার ভাই, সাধ না মিটিল, কোন মিল নেই তবু, স্বর্গ হতে বিদায়, সিন্ধু নিকটে যদি, গরল অমিয় ভেল ইত্যাদি। বেশ কিছু গল্পের নামকরণে সুবোধ ঘোষের সাংকেতিকতার প্রয়োগ লক্ষ্য করার মত।

পুরোন একটি গাড়ি জগদ্দলের সঙ্গে গাড়ির মালিক বিমলের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যে সম্পর্ক গল্পটিকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে, সেই সম্পর্ককে লেখক সার্থকভাবেই 'অযান্ত্রিক' আখ্যা দিয়েছেন। লক্ষ বছর পরে খনি গহ্বরে শ্রমিকদের রক্তচিহ্নবর্জিত মৃত দেহগুলো ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে তাদের অতীতের দৈহিক অস্তিত্বই শুধুমাত্র প্রমাণ করবে। ইতিহাস বিলুপ্ত সেই শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণের গল্পটির নামকরণ করা হয়েছে 'ফসিল'।

সামাজিক অবিচারের শিকার ধনিয়া তারই নিজস্তন্যপানে লালিত পুরুষের লালসা চরিতার্থ করার জন্য পতিতাপল্লীর কুঠুরিতে অপেক্ষমান। চিত্রটি যেন লেখকের কাছে মাতৃহত্যার সংকেত বয়ে এনেছে, লেখক গল্পটির নাম দিলেন 'পরশুরামের কুঠার'। অন্য একটি গল্পে, একজন 'প্রকৃত সুন্দরী' কে বিয়ে করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সুকুমারের লালসার শিকার হয়েছে এক কুৎসিৎ ভিখারী তুলসী। আবার সুকুমারের বাবা কৈলাশ ডাক্তার তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলসীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে উচ্ছসিত তার অন্তরসৌন্দর্যে। গোটা গল্প জুড়েই রয়েছে সৌন্দর্যতত্ত্ব। কী সুন্দর! কোথায় সুন্দর! কেন সুন্দর! কতক্ষন সুন্দর – প্রশ্ন ওঠে। সুবোধ ঘোষ গল্পের এই মূল সংকেতটিকে প্রাধান্য দিয়ে, গল্পটির নামকরণ করেছেন 'সুন্দরম'। ভিখারিনী সুহাসিনি পল যুবক ইঞ্জিনীয়ার মাধবকে জানায় সেই তার জন্মদাত্রী মা। উদ্দেশ্য 'চ্যারিটি'র নামে কিছু বেশি টাকা পয়সা আদায় করা এবং বাধবের মা তাকে অর্থসাহায্য করার পরিবর্তে যে অপমান

করেছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া। সুহাসিনীর এই অদ্ভুত চালে মাধবের শিক্ষিত অন্তরও দুলে উঠেছে। মাধবের মনের সেই অবস্থাকে সম্ভবত মহাভারতের কুন্তীপুত্র কর্ণর সঙ্গে তুলনা করেই লেখক সাঙ্কেতিকভাবে গল্পের নাম রেখেছেন - কৌন্তেয়। ইতিহাসে তিনটি পানিপথের যুদ্ধের কথাই আছে। তিনটি পানিপথের যুদ্ধেই তৃতীয় একটি শক্তি নিরপেক্ষ থাকায়, পাঠানরা প্রথম দুবার পরাজিত হয়, তৃতীয়বার পরাজিত হয় মারাঠা শক্তি। একটি গল্পে আমরা দেখি, ভারতের আদিবাসী শক্তি তৎকালীন বাঙালী সমাজের উদাসিক নিরপেক্ষতায় শাশক ইংরেজের কাছে এক নীরব যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছে। গল্পে কোথাও লেখক পানিপথের যুদ্ধের কথা উল্লেখ না করে পানিপথের তিনটি যুদ্ধে পাঠান ও মারাঠাদের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে, লেখক গভীর সাংকেতিকতায় গল্পটির নামকরণ করেছেন 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ। — একইভাবে সুবোধ ঘোষের বহু ছোটগল্পের নামকরণে তাঁর সাংকেতিকতার সফল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

ইতিমধ্যে বলা হয়েছে সুবোধ ঘোষের রচনা ছিল খুবই পরিকল্পিত। একটি গল্প লেখার পূর্বে তিনি সেই গল্পের পরিকাঠামো তৈরী করে নিয়ে পরে শব্দের জাল বুনতেন। গল্পের কাহিনীটিকে গুটিয়ে এনে কি ভাবে গল্পটিকে সমাপ্তিতে পৌঁছে দেবেন, সে পরিকল্পনা করে রাখতেন পূর্বাহ্নেই। কথা ও সুরের উপযুক্ত সমন্বয়ে যেমন এক একটি সঙ্গীত সার্থক এবং সুশ্রাব্য হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনই এক একটি গল্পকে সার্থক ও সুখপাঠ্য করার জন্য সুপরিকল্পিত কাঠামোর উপর উপযুক্তভাবে কাহিনীর বিন্যাস ঘটিয়ে শিল্প সুষমায় ফুটিয়ে তুলতেন সুবোধ ঘোষ। আরো সুস্পষ্টভাবে তাঁর রচনাশৈলী ব্যাখ্যা করতে গেলে বলা যায় – আধুনিক স্থাপত্য বিদ্যায় একটি মনোরম অট্টালিকা নির্মাণের ভিত্তি যেমন স্থপতির কাগজে আঁকা মাপাজোখ সমন্বিত রেখাচিত্র, ঠিক তেমনই সুবোধ ঘোষের প্রায় প্রতিটি গল্পের পেছনেই রয়েছে একজন সফল স্থপতির মতো আগাগোড়া এক সুনির্দ্দিষ্ট ছক। তাই তাঁর গল্প মেদবর্জিত, সুনিয়ন্ত্রিত এবং গল্পের সমাপ্তিতে পৌঁছানোর জন্য পাঠকের আগ্রহে টানটান। সুবোধ ঘোষের গল্প রচনার এই বিশেষ শৈলীর সমর্থনে অমিতাভ চৌধুরীর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে —

> সাগরদা – সাগরময় ঘোষ তাঁর 'সম্পাদকের বৈঠকে' সুবোধবাবুর গল্প লেখার বিচিত্র কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন। বিশেষ করে 'থিরবিজুরি' গল্পটির। সুবোধবাবুর লেখা ছিল সিনেমার শুটিংয়ের মত। প্রথমে লিখতেন শেষ প্যারা, তারপর মাঝখানের আট প্যারা আবার শেষ প্যারার আগের ছয় প্যারা এবং সর্বশেষে প্রথম প্যারা। লেখাটা কম্পোজ হয়ে এলে পর সুবোধবাবু নিজেই ওলটপালট করে ঠিক ঠিক সাজিয়ে নিতেন।[২]

ছোটগল্পের সূচনার ক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষ বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গল্পারম্ভে তিনি হয় চরিত্রের পরিচয় তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে, নয়ত পরিবেশ বর্ণনার মধ্য দিয়েই শুরু করেছেন গল্প। সূচনার এই বর্ণনা কোথাও দু-এক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোথাও বা সূচনার অনুচ্ছেদটি দীর্ঘতর। প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' এর সূচনায় বিমল ও তার গাড়ি জগদ্দলের পরিচয় দিয়েছেন লেখক।

> বিমলের একগুঁয়েমি যেমন অব্যয় তেমনি অক্ষয় তার ঐ ট্যাক্সিটার পরমায়ু। সাবেক আমলের একটা ফোর্ড, প্রাগৈতিহাসিক গঠন, সর্বাঙ্গে একটা কদর্য দীনতার ছাপ। যে নেহাৎ দায়ে পড়েছে বা জীবনে মোটর দেখেনি, সে ছাড়া আর কেউ ভুলেও বিমলের ট্যাক্সির ছায়া মাড়ায় না।[৩]

শুধুমাত্র চরিত্রের পরিচয় দিয়ে শুরু করেছেন বিভিন্ন গল্প। যেমন, গরল অমিয় ভেল, বর্ণচোরা,

আবিস্কার, কথামালা, জঞ্জালীর জ্বালা, আত্মজা, হঠাৎ গোধূলি ইত্যাদি।

> মেহেদি গাছের বেড়ের ওপারে চন্দ্রবাবুর বাড়ির একটি জানালা। প্রায় সব সময় একটি মেয়েকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মেয়েটির নাম মালা বিশ্বাস। চন্দ্রবাবুর মেয়ে। শহরের সকলেই একে চেনে।[৬] (গরল অমিয় ভেল)

কখনো কখনো দু-একটি বাক্যে এমনকি অতি সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যেও চরিত্রের পরিচয় দিয়ে গল্পারম্ভ করেছেন লেখক।

> 'অনুকুল গোঁসাই রামপুর জেলের সান্ত্রী' (দন্ডমুন্ড)
> 'সনাতন আর সনাতনের মেয়ে সুধা। যেমন বাপ তেমন মেয়ে' (ঠগিনী)
> 'ওয়াটকিনস্ মূরের ছেলে বেসিল মূর পাগল' (শক্‌থেরাপী)
> 'তাঁর নাম সাধু রামানন্দ (ঐশ্বরিক)

লেখক পরিবেশ বর্ণনার মধ্য দিয়েও বেশ কিছু গল্পের সূচনা করেছেন। যেমন, পলাশের নেশা, উচলে চড়িনু, রুপো ঠাকরুনের ভিটা ইত্যাদি।

> 'শহরের পাকা চেহারার গা ঘেঁষে একটি কাঁচা চেহারার জায়গা। নাম রাজা পার্ক। মিউনিসিপ্যালিটির হাতে আসবার পর থেকে রাজা পার্কের অনেক উন্নতি হয়েছে' (পলাশের নেশা)

> 'তেঁতুলিয়া মাঠের ঘাসের রঙ বার মাস সবুজ। অনেক দিন আগে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে বাইরে আসতেই দিনেশ বড় সুন্দর একটা দৃশ্য দেখেছিল। তেঁতুলিয়া মাঠে লাল কৃষ্ণচূড়ার ভাঙা ভাঙা ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল কোথা থেকে। আজ আবার ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে – তেঁতুলিয়া মাঠের সবুজে হঠাৎ কোন উত্তুরে হাওয়ায় রঙিন তুষারের ফুল কতকগুলি এসে ছড়িয়ে পড়েছে। একদল ইরানী বেদের মেয়ে – মাঠের এককোণে পড়েছে তাদের তাঁবু'। (উচলে চড়িনু)

গ্লানিহর গল্পের শুরু হয়েছে সমুদ্রযাত্রার পরিবেশ বর্ণনা দিয়ে। বর্ণিত এই পরিবেশের সঙ্গে গল্পের বিষয়বস্তু এবং কাহিনীর শীর্ষবিন্দু বা ক্লেম্প্ক্স এর প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক না থাকলেও সমুদ্রের পরিবেশের এই বর্ণনা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়নি। কারণ গল্পের শেষে লেখকের কল্যাণ কামনা এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার আভাস নিহিত আছে গল্পারম্ভে তাঁর সমুদ্রের বর্ণনায়।

> হিরাতো মারু পোতাশ্রয় ছেড়ে অনেক দূরে এগিয়ে এসে এবার ডাইনে মোড় নিল। ধীরে মিলিয়ে গেল অ্যাপোলো বন্দরের অভ্রলেহী টাওয়ার আর ঠাসাসাসি নোঙর করা কার্গোবোটের মাস্তুলের ভীড়। নিস্তরঙ্গ আরব সাগরের বুক চিরে হিরাতো মারু চলল ক্ষুব্ধ সিন্দুঘোটকের মত সাঁতার দিয়ে; তার সধূম প্রশ্বাসবায়ু মেঘের মত উড়ে গিয়ে এলিফান্টা পাহাড়ের ছোট চূড়াটাকে গিরে ধরল। বোম্বাইয়ের মাথার উপর তার গনমসী কালো ধোঁয়ার সুগোল মারাঠী টুপিটা শুধু সুস্থির হয়ে লেগে রইল উত্তরের আকাশে।[৫]

সুবোধ ঘোষের গল্পারম্ভের বৈচিত্র্যও লক্ষ করার মত। মাত্র দেড় লাইনের সংক্ষিপ্ত সূচনায় কোন চরিত্র, পরিবেশ বা প্ররিপ্রেক্ষিতের বর্ণনা না করে, প্রাক্‌কথনে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

স্টেশনটার নাম বললে সকলেই বুঝে ফেলতে পারেন, কলকাতা থেকে কত দূরের আর কোন্ জায়গার কথা বলা হচ্ছে।[৬] (ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান)

কোথাও বা হঠাৎ শুরু করেই, সরাসরি কাহিনীতে প্রবেশ করেছেন লেখক।

দেখতে পায় অজিত, সেই তরুণী শেষ পর্যন্ত জিনিসটা না কিনেই চলে যাচ্ছে। এমন কিছু দামী জিনিস নয়। আধ পাউন্ড রঙীন উল। দোকানদারের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে দরাদরি করেছে তরুণী। দাম কমাবার জন্য বার বার বলেছে। কিন্তু দোকানদার এক পয়সাও দাম কমাতে রাজি হয় না।[৭] (অচিন রাখী)

লেখক কোথাও শুরু করেছেন প্রত্যক্ষ উক্তি দিয়ে, কোথাও একটি সাধারণ যুক্তি দিয়ে শুরু করে গল্পের খেই ধরেছেন, কোথাও বা গল্পটি শুরু করেছেন প্রচলিত প্রবাদবাক্য দিয়ে।

''সুনীতিবালা বলেন – হোক অপমান তবু আমি যাব'' (মাঙ্গলিক)
''কোন উপায় যখন নেই, তখন চিন্তা করে লাভ কি ?'' (বিজয়িনী)
''শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না, ঠিক কথা।'' (প্রিয়ংবদা)

কয়েকটি গল্প শুরুই হয়েছে সরাসরি কাহিনী দিয়ে। হঠাৎ আরম্ভ হওয়া এই গল্পগুলোর সূচনায় ভূমিকার লেশমাত্র নেই। যেমন, ফল্গু ও ফাল্গুন গল্পটি —

আর দেরী না করে, আগন্তুক ভদ্রলোককে স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে, আপনি এখন চলে যান। কারণ, আপনি যাঁর নামে চিঠি নিয়ে এসেছেন, তিনি এখন বাড়িতে নেই... তিনি আজও নয় কালও নয় একেবারে পরশু দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরবেন। তাছাড়া বাড়িতে এখন দ্বিতীয় কোন পুরুষ মানুষও নেই যে আপনার সঙ্গে কোন কথা নিয়ে আলোচনা করতে পারে।[৮]

অন্য বেশ কয়টি গল্প লেখক খুবই সাদাসিধে ভাবে শুরু করেছেন। কখনো একটি পরিচিত সামাজিক সমস্যা তুলে ধরে, কখনো বা মানুষের রহস্য সন্ধানী মনকে উস্কে দিয়ে। কিন্তু লঘু চালে শুরু হলেও কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখা যায়, সমস্যা অনেক গভীরে, মূল রহস্য মানুষের বিচিত্র অন্তরে। বিয়ের এক সাধারণ সমস্যা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে 'সুন্দরম' গল্পটি যদিও কাহিনীর বক্তব্য আদৌ সাধারণ নয়।

সমস্যাটা হলো সুকুমারের বিয়ে। কি এমন সমস্যা ! শুধু একটি মনোমত পাত্রী ঠিক করে শুভলগ্নে শাস্ত্রীয় মতে উদ্বাহ কার্য সমাধা করে দেওয়া; মানুষের একটা জৈব সংস্কারকে সংসারে পত্তন করে দেওয়া। এই তো ![৯]

'জল রাক্ষস'-এ এক অবাস্তব আশংকা দিয়ে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে।

মানুষ নয়, জন্তু নয় ভূতও নয়। তবে কি ? সবাই বলে, ওটা হল মানুষেরই মতো দেখতে এক ধরণের ভুতুরে জন্তু। নদীর জলের গভীরে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভেসে উঠে। ভেসে উঠলোও চেহারার সবটুকু ঠিক দেখা যায় না। শুধু মাথার লম্বা লম্বা চুলের গোছা জলের উপর ভাসতে থাকে। শাঁখ বাজালেই তলিয়ে যায়।[১০]

মা হিংসী : গল্পটি শুরু হয়েছে দায়রা জজের রায় পাঠকের মধ্য দিয়ে। বিচারক খুনের আসামী গিরিধারী গোপের বিচারের রায় আদালতে পড়ে শোনাচ্ছেন।

> অজস্র প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, আসামী গিরিধারী গোপ বহুদিন আগে থেকেই হিংস্র হয়ে উঠেছিল। বর্তমান মামলা আসামীর সেই বিকৃত জীবন ও স্বভাবের চরম পরিণাম। পৃথিবীতে পত্নীনির্যাতক নামে এক ধরণের লোক দেখা যায়, আসামী গিরিধারী বোধহয় নিষ্ঠুরতায় সেই অপমানবদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অন্যতম। প্রতিদিন ও প্রতিকথায় সে তার স্ত্রীকে অকথ্য প্রহার অত্যাচার ও নির্যাতন করত।[১১]

এমনভাবে সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের সূচনা-বৈচিত্র্যের অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তবে গল্পের সূচনায় অভিনব বাক্য বিন্যাসের বিচারে লেখকের সুনিকেতা গল্পটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। গল্পটিতে মাত্র দুটি লাইনের প্রথম অনুচ্ছেদে লেখক আটটি সরল এবং সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার করেছেন যার উদাহরণ বাংলা কথাসাহিত্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

> কলকাতার পল্লী। লেক দূরে নয়। কংক্রিটের 'নীলকমল'। বিরাট চারতলা। কাঁচা দুধের মতো রঙ। শেষ চৈত্রের সন্ধ্যা। গুলমোরের মাথায় দুরন্ত সোনা। ছোট ছোট ঝড় উড়ে যায়।[১২]

লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, গল্পের সূচনায় এই আটটি বাক্যের মধ্যে, প্রথম সাতটিতে কোন ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় নি।

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে পটভূমি নির্বাচনের বৈচিত্র্যও লক্ষ করার মত। তাঁর অনেক গল্পের পটভূমি বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল, কলকাতা এবং তার নিকটবর্তী এলাকা, মহারাষ্ট্র এমনকি সুদূর নেফা অঞ্চলের পটভূমিতে রচিত হয়েছে অনেক গল্প। কলকাতা এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলের পটভূমিতে রচিত গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে, কৌন্তেয়, পুষ্পকীট, মায়াকুহেলী, গুহামানব প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের পটভূমিকায় রয়েছে শান্তিদাতা, তমসাবৃতা এবং অন্যান্য গল্প, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকার পটভূমিতে রচিত হয়েছে বৈরনির্যাতন।

ভৌগলিক পটভূমি ছাড়াও তিনি সার্কাস, অফিস, মেলা, সমুদ্রযাত্রা, জেল, যুদ্ধ প্রভৃতির পটভূমিকাতেও বেশ কিছু গল্প রচনা করেছেন। আবার লেখকের এমন অনেক গল্পও রয়েছে যে সব গল্পের পটভূমির ভৌগলিক অবস্থান নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়।

আমরা দেখেছি সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্ত চরিত্রের কঠোর সমালোচক। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলোতে অনেক মধ্যবিত্ত চরিত্র রয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি তাঁর গল্পে ভিড় করেছে অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ। যেমন অযান্ত্রিক মোটরগাড়ি চালক, ফসিলে খনি শ্রমিকেরা, মধুরেণ সমাপয়েৎ-এ পাথরকাটা মানুষ, গোত্রান্তরে চিনিকলের শ্রমিক ও আখচাষী, তমসাবৃতায় তাঁতশিল্পীরা, তিন অধ্যায় পৌরসভার কর্মী, সবলায় ডোম, পুষ্পকীটে হরবোলা নৃপেন অঙ্গদায় সার্কাসকর্মী, ঠগেন ঘরে হস্তরেখা বিচারক, স্বপ্নাতীতে দোকানদার, ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানে সাইকেল রিক্সা চালকেরা।

শুধু মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবি মানুষই নয়, সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষের সদম্ভ উপস্থিতিও সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে ছাড়িয়ে রয়েছে। শ্মশানচাঁপায় ঘাটবাবু, পরশুরামের কুঠারের ধনিয়া, ঠগিনীর - সানাতন ও তার মেয়ে সুধা, কৌন্তেয়-র সুহাসিনী পল্, তিন অধ্যায়ের – সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার অহিভূষন, পুলিন চামার ও তার মেয়ে হাসপাতালের আয়া বন্দনা, তমসাবৃতায় কুঞ্জবুড়ো এবং জবা সহ তাঁতিপাড়া এবং বাউরিপাড়ার মানুষেরা, সবলার – জহ্লাদ এলাচি ডোম ও তার মেয়ে টুকিয়া, মা হিংসীতে প্রাণদন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত গিরিধারী এই চরিত্রগুলো সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

ছোটগল্পকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। সূচনা, মধ্যভাগ এবং সমাপ্তি। মূল কাহিনী, কাহিনীর সমস্যা, সঙ্কট, দ্বন্দ্ব মধ্যভাগেই বর্ণিত হয়ে থাকে। কাজেই একটি ছোটগল্পের সাফল্যের পেছনে এই মধ্যভাগের গতি-প্রকৃতি এবং রচনাশৈলীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ। সাধারণত এই মধ্যভাগেই গল্পের কাহিনী পৌঁছে যায় তার CLIMEX অর্থাৎ শীর্ষবিন্দুতে। সুবোধ ঘোষেরও অনেক ছোটগল্পের মধ্যভাগেই কাহিনীর শীর্ষবিন্দু রচিত হয়েছে।

সুবোধ ঘোষের অযান্ত্রিকে কাহিনীর কোন ঘনঘটা নেই। বিমল এবং তার অতি পুরোন মোটরগাড়ি জগদ্দল ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্বচরিত্রও নেই। প্রকৃতপক্ষে, মোটর গাড়িটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেই লেখক যেন এক জীবন্ত চরিত্র হিসেবে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। বিমল ও জগদ্দলের মধ্যে একটি মানবিক সম্পর্ক স্থাপন করে গল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে মধ্যভাগে পাঠককে ট্রেজিডি কে পৌঁছে দিয়েছেন।

> বিমল খনিকক্ষণ নিস্পলক চোখে তাকিয়ে রইল দু'জনের দিকে। ভবিতব্যের ছায়ামূর্তি তার পরম ক্ষুধার দাবী নিয়ে, ভিক্ষাভাণ্ডটি প্রসারিত করে আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এমনিতে ফিরবে না সে, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা চাই। ব্যাপারটা বুঝল বিমল।
>
> – হ্যাঁ আছে পুরানো লোহা, অনেক আছে, কত দর দিচ্ছেন ?
> – চোদ্দ আনা মণ বাবুজী, মারোয়াড়ীর ব্যগ্র জবাব এলো। লড়াই লেগেছে, এই তো মওকা, ঝেড়েপুঁছে সব দিয়ে ফেলুন বাবুজী।
> – হ্যাঁ সব দেব। আমার ঐ গাড়িটাও দেব। ওটা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে।[১৩]

ফসিল-এ Climex গড়ে উঠেছে মধ্যভাগের অনেকখানি জুড়ে। পাঠক তখনই কাহিনীর শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যায় যখন পরস্পর বিরোধী সামন্তশক্তি বণিকশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে শ্রমিক নেতা দুলাল মাহাতোকে হত্যা করে এবং ধ্বসে পড়া খনির গহ্বরে চিরকালের মত লুকিয়ে ফেলে মাহাতো এবং দুর্ঘটনার মৃত অন্যান্য শ্রমিকদের মৃতদেহ।

> অভূতপূর্ব দৃশ্য। মহারাজা, সচিবোত্তর আর ফৌজদার – গিবসন, ম্যাকেকনা, মূর আর প্যাটরসন ! সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেন্টারের ঠাসাঠাসি।...
> এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আশু কর্তব্য কি নির্ধারিত হয়ে গেছে, ফৌজদার সেটা মুখার্জির কানে কানে সংক্ষেপে শুনিয়ে দিল। নিরুত্তর মুখার্জি চমকে ওঠে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ। তারপর শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে বসে থাকে। গিবসন মুখার্জির পিঠ ঠুকে বলে – এসব কাজে একটু শক্ত হতে হয় মুখার্জি, নার্ভাস হবেন না।[১৪]

পরশুরামের কুঠারে – নয়াবাদ শহরের চরিত্র দ্রুত বদলে গেছে নতুন অর্থনীতির জোয়ারে। ধনিয়া একজন সুস্থ সবল আয়া। ভদ্রঘরের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোই তার পেশা। কারণ – 'ভদ্রবাড়ির প্রসূতিদের একটা না একটা আধি ব্যাধি লেগেই আছে। কেউ সূতিকায় জর্জর, কেউ রক্ষহীনতায় সিঁটিয়ে যায় কারও বা বুকের অপত্যনির্ঝর অকালে স্তব্ধ হয়ে গেছে' নয়া অর্থনীতিতে নয়াবাদের দ্রুত পরিবর্তনে – 'সাগর পার থেকে ধনিয়ার বহু নতুন প্রতিদ্বন্দ্বি এসেছে হরেক রকমের বিলিতি ফুড'। ধনিয়ার প্রয়োজন শেষ হয়। পতিতা পল্লীতে বাধ্য হয়ে ঠাঁই নেবার আগে ধনিয়া শেষবারের মত তার স্তন্যপান

করায় বৃদ্ধ চাচা প্রসাদী ডোমকে। এখানেই ধনিয়ার সর্বজনীন মাতৃত্বের শেষ অধ্যায়। এখানেই রচিত হয়েছে গল্পের শীর্ষবিন্দু।

> তুমি রাগ করেছ চাচা ! ধনিয়া আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে অসহায় অসাড় প্রসাদীর জরাজর্জর শরীরটাকে বেড়ালের ছানার মত কোলের উপর তুলে নিল। কাঁছুলি খসিয়ে প্রসাদীর মাথাটা চেপে ধরলো বুকের কাছে। আঙুল দিয়ে বুড়োর মাথার পাকা চুলের জটগুলি ছাড়িয়ে দিতে লাগলো আস্তে আস্তে।[১৫]

সুন্দরম গল্পটির শেষ বাক্য – 'শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে' যদিও পাঠকের কাছে তুলসীর হত্যাকারীর এবং তুলসীর গর্ভস্থ সন্তানের পিতার পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছে তবুও গল্পের দ্বোন্দ্বিক রচিত হয়েছে যখন কৈলাশ ডাক্তার মর্গের টেবিলে লাশের ঢাকনা সরিয়েই তুলসীকে চিনতে পারে।

> লাশের ঢাকাটা খুলে ফেলতেই কৈলাশডাক্তার চম্‌কে উঠলেন – অ্যাঁ, এ কে রে যদু ?
> যদু ততক্ষণে আলগোছে সরে পড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৈলাশডাক্তারের প্রশ্নে ফিরে এসে বললো – হ্যাঁ হুজুর তুলসীই, সেই ভিখিরী মেয়েটা।[১৬]

সাধারণভাবে গল্পের শীর্ষবিন্দু গল্পের মধ্যভাগে গড়ে উঠলেও, সুবোধ ঘোষের কোন কোন গল্পে শীর্ষবিন্দুটি রচিত হয়েছে একেবারে সমাপ্তিতে। যেমন 'গরল অমিয় ভেল' গল্পের নাইকা মালা বিশ্বাসের মুখে বসন্তের দাগ, কালো মোটা চেহারা। অদ্ভুত এবং উদ্ভট সাজসজ্জা করে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মালা। ঐ অঞ্চলের বেড়ানোর জায়গা রানীঝিলের কাছে অতি প্রাচীন কালো পাথরের বুকে মাঝে মাঝেই এলাকার এক একটি মেয়ের নামে কুৎসা লেখা হয় এবং মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গেই এলাকায় এক পরিচিতি লাভ করে, বিখ্যাত হয়ে ওঠে। অপবাদ প্রশস্তিতে পরিণত হয়। অদৃশ্র লেখকের সন্ধান পায় না কেউ। একে একে কালো পাথরের অপবাদের সুবাদে পূর্ণিমা, সুমিতা, সুধা, প্রীতি এবং মুক্তি শহরের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে মালা বিশ্বাস তার সাজ-পোষাকে সম্ভাব্য সব রকম পরিবর্তন করেও আকর্ষণের বিচারে পূর্ণিমাদের ধারে কাছেও পৌঁছোতে পারে নি। 'তার এতদিনের আত্মবিজ্ঞাপনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে'। – পাঠক এ পর্যন্ত পাঠ করার পরেও উৎসুক হয়ে খুঁজতে থাকে কালো পাথরের অদৃশ্য লেখককে। গল্পের সমাপ্তিতে আমরা দেখি, এক দুর্যোগের সন্ধ্যায় মালা বিশ্বাস নিজে গিয়ে সেই কালো পাথরের বুকে নিজের নামে কিছু মিথ্যে অপবাদ লিখে আসে।

> – মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার ...
> থাক্, বেচারাদের নাম আর করবো না। কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমার চিঠির তাড়া রানীঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও।[১৭]

এখানেই গল্পের শেষ হয়েছে, আর এখানেই পাঠক পৌঁছেছে গল্পের শীর্ষবিন্দুতে। গল্প শেষের এই চমকে পরিষ্কার হয় যে অদৃশ্য কুৎসা-লেখককে খুঁজে বের করা লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না, একমাত্র লক্ষ্য ছিল একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্য প্রতিষ্ঠা করা যে একজন যুবতী নিজেকে স্বভাবতই পুরুষের কাছে আকর্ষণীয়া ভাবতে ভালবাসে। অবজ্ঞার পাত্রী হিসেবে নয়।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে শেষ অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক গল্পেই সমাপ্তির দু-একটি বাক্য গল্পটিকে এত শিল্পমন্ডিত করে তোলে যে গল্পটি পাঠের পর পাঠকের মন নতুন করে আলোড়িত হয়, পাঠকের

মনে নতুন করে গল্পের চরিত্রগুলো জেগে উঠে, গল্প সার্থক হয়। গল্পের সমাপ্তি নিয়ে অনেক পরীক্ষা, নিরীক্ষা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই গল্পের সমাপ্তিও বিভিন্ন রকমের। তবে সাধারণভাবে ছোটগল্পের সমাপ্তিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরণের গল্পের সমাপ্তিতে থাকে চমক, অন্য ধরণের গল্প ঠিক চমকপ্রদ নয়, গল্পের ঘটনা অনুসরন করে স্বাভাবিক ভাবেই পরিণতিতে পৌঁছোয়।

> বেশির ভাগ ছোটগল্পকার যেমন বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ (এমনকি ফরাসী ভাষায় মোপাসাঁও) দু-ধরণের 'সমাপ্তি' নির্মাণেই সফলতা পেয়েছেন। এই একই কথা বলা যেতে পারে সুবোধ ঘোষ সম্পর্কেও।[১৮]

চমকান্ত গল্পে শেষের বাক্যগুলো পাঠ করে, পাঠক আবার নতুন করে সদ্য সমাপ্ত গল্পটি নিয়ে ভাবতে শুরু করেন, কখনো গল্পের চরিত্রগুলো সম্পর্কে নতুন করে মূল্যায়ন শুরু করেন, কখনো বা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েন। যদিও এ ধরণের গল্পের শেষাংশের চমক প্রায়শই কাহিনীর বিষয়বস্তু বা বর্ণিত চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে না, এক নতুন মাত্রা যোগ করে মাত্র।

চমকহীন গল্পের সমাপ্তিতে নতুন উৎকন্ঠা, বা সমস্যা বা নতুন ভাবনার সৃষ্টি না হওয়ায়, গল্পের অনুমিত পরিণামে পাঠক স্বাভাবিক তৃপ্তি লাভ করেন। সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে আমরা চমকান্ত এবং চমকহীন দুধরণের গল্পেরই পরিচয় পাই। সুবোধ ঘোষের এই দু-ধরণের গল্পের কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বেশ কিছু গল্প সুবোধ ঘোষ দারুণ চমক দিয়ে শেষ করেছেন। যেমন, সুন্দরম, গরল অমিয় ভেল, চতুর্ভূজ ক্লাব, বারবধূ, পারমিতা, একতীর্থা ইত্যাদি।

সুন্দরমের সর্বশেষ বাক্য '– শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে'। এই বাক্যটির পূর্বেই কৈলাশ ডাক্তারের চোখে আমরা ভিখারিনী তুলসীর গর্ভের অভ্যন্তরে সঞ্চারিত ভ্রূণের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করছিলাম। অপূর্ব ধ্বনি সুষমায় 'মাতৃত্বের রসে উর্বর, মানব জাতির মাংসল ধরিত্রীর রূপ বর্ণনার ঠিক পরেই শেষের অশালীন এই উক্তি পাঠককে এক লহমায় চমকে দিয়ে বাস্তবের বধ্য ভূমিতে এনে আছড়ে ফেলে। এই বাক্যটি সম্পর্কে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন —

> সংস্কারের দাসত্ব থেকে যে মুহূর্তে যার মুক্তি মিলেছে, সেই মুহূর্তে তার কাছে সবই সুন্দর। কিন্তু এই যে বিনিশ্চয়, যা কিনা সৌন্দর্যতত্ত্বের একেবারে মৌলিক একটি সত্যের দিকে আমাদের চোখ ফিরিয়ে দেয়, এটাই আমাদের প্রত্যাশার বৃত্তে ছিল না, এবং এই কারণেই গল্পের উপসংহারের বাক্যটিকে নিতান্ত একটা মোচড় বলে আমাদের মনে হয়েছিল।[১৯]

আবার এই বাক্যটিই পাঠককে চিনিয়ে দেয় তুলসীর এই পরিণতির জন্য দায়ীকে।

চতুর্ভুজ ক্লাব গল্পটি শেষ হয়েছে সঙ্গে কোন সম্পর্কহীন রাতুলদির একটি চমকপ্রদ উক্তি 'একটি বাঁদর আর একটি বাঁদরী' দিয়ে।

গল্পটিতে আমাদের সমাজের বৈবাহিক রীতির Acid test করা হয়ে হয়েছে। চার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। উত্তম পুরুষে লেখক, দীপু, নরু এবং বিনু। লেখকের ছিল একটি গ্রামোফোন, দীপুর একটি সাইকেল এবং নরুর একটি ক্যামেরা। কিন্তু এ সবই ক্লাবের সম্পত্তি। সবার সমান অধিকার। বিনুর বিয়ে হল, বৌ-টুকু। স্বাভাবিকভাবেই এই টুকু বৌও যেন গ্রামোফোন, সাইকেল এবং ক্যামেরার মত ক্লাবেরই সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হতে লাগল। কাহিনী এগিয়ে চলে। শেষে দেখা গেল টুকু বৌ, ক্লাবের বৌ নয় বিনুরই বৌ। ভেঙে গেল ক্লাব। গ্রামোফোন, সাইকেল, ক্যামেরা যার যার সম্পত্তি বুঝে নিয়ে বেরিয়ে গেল তিন বন্ধু। কাহিনীর এখানেই শেষ। তবে গল্পটি সুবোধ ঘোষ এখানে শেষ করেন নি।

ক্লাব গুটিয়ে চলে যাবার সময় লেখক দেখতে পেলেন বিনুদের বাড়ির দিকে 'ড্যাবা' চোখে তাকিয়ে আছে 'একটি বাঁদর আর একটি বাঁদরী'। — শেষের এই চমকে লেখক চতুর্ভুজ ক্লাবের গল্প থেকে বেড়িয়ে এসে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে মানব সভ্যতায় অনেক সংস্কার সাধিত হলেও মানুষ বাঁদরের মতই এখনও 'এক পুরুষ শাসনব্যবস্থা'তেই আস্থাশীল। নারী কখনো সমষ্টিগত সম্পত্তি হতে পারে না। আরো মনে হয় গল্পের প্রয়োজনে এই অন্তিম বাক্যটি রচিত হয়নি, সম্ভবত: সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্ক ও অধিকার নির্ণায়ক এই মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনেই গল্পটি রচিত হয়েছে। বাক্যটি পাঠকের কাছে Sudden Surprise হলেও এটি লেখকের Hidden Agenda.

একইভাবে 'বারবধূ' গল্পের অন্তিম বাক্যটিতেও চমক লক্ষ্য করার মত। তারকেশ্বরের পতিতা পঞ্চীবিবিকে প্রসাদ ভাড়া করে নিয়ে এসেছে নতুন জায়গায় নারী সাহচর্যে জল-হাওয়া বদলের জন্য। হাওয়া বদলের জন্য অন্য কয়েকটি বাঙালী পরিবারও এসেছে সেখানে। তাদের কাছে মান বাঁচাতে পঞ্চীবিবিকে প্রসাদের স্ত্রী সাজতে হয়। সেখানে তার নাম লতা। ইতিমধ্যে প্রসাদ সেখানে বেড়াতে আসা এক তন্বী বিধবা আভাকে ভালবেসে ফেলে। তার কাছে ভাড়াটে পঞ্চীবিবির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। আভাকে আপন করে পেতে প্রসাদ নকল বধূ লতাকে হাতে তুলে দেয় নোটের তাড়া। লতার স্বপ্নভঙ্গ হয়। গল্পটি এখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু লেখক তা করেন নি। গৃহবধূ লতার অভিনয় করার জন্য পারিশ্রমিক হাতে নিয়ে তারকেশ্বরের পঞ্চীবিবি তার পুরোন জীবনে ফিরে যাবার পূর্বে আক্ষেপ করে বলে — 'আভা ঠাকুঝি আমার এই সর্বনাশটা করে ছাড়লো'।

এই উক্তিটিতেই গল্পের সমাপ্তি। শেষ এই বাক্যটির প্রধান চমক 'ঠাকুরঝি' শব্দটিতে। এই একটি শব্দের ব্যবহারেই বারবধূ এবং গৃহবধূর সমস্ত ব্যবধান মিটিয়ে দিয়েছেন লেখক। তাই পঞ্চীবিবি ওরফে লতা অতি সহজেই আভাকে 'ঠাকুরঝি' সম্বোধন করতে পেরেছে। শেষের এই বাক্যটিতে চমক দিয়ে লেখক প্রমাণ করে দিয়েছেন যে নিজস্ব একটি সংসারের স্বপ্নে বারবধূ এবং গৃহবধূর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেখানে সব নারীই এক এবং অভিন্ন।

পারমিতা, অল্পবয়সী এবং বিধবা। মনোময়কে উদ্দেশ্য করে পারমিতার প্রত্যক্ষ উক্তিতে গল্পটি শেষ হয়েছে — 'বলে দেবেন পারুমাসী এতদিনে আবার স্বামীকে পেয়ে স্বামীর কাছে চলে গিয়েছে'। কাহিনী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে দেখা যায় পারমিতা বিত্তবান এবং বিপত্নীক মনোময়ের বাড়ীতে তার শিশুকন্যা মন্টুর নাচের দিদিমণি হয়ে প্রবেশ করেছে। এবং ক্রমশ নিজগুণে সংসারের হাল ধরেছে। সুপুরুষ মনোময়কে ভালবেসেছে এবং একান্তভাবে আশা করেছে একদিন মনোময়ের কাছ থেকেই এ বাড়ির ঘরণী হবার ডাক আসবে। শিকারী মনোময়ের শিকারের ব্যবস্থাপক, হত-দরিদ্র, বেঢপ চেহারার হর্ষনাথকে পারমিতার খুবই অপছন্দ। একদিন হর্ষনাথ সুযোগ বুঝে তাকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিল। সেই প্রস্তাবে খুবই অপমানিত বোধ করেছিল পারমিতা। হর্ষনাথের প্রতি সে একান্তই বিরূপ। একদিন সত্যিই ডাক এলো মনোময়ের কাছ থেকে। আশায় উৎফুল্ল পারমিতা মনোময়ের ঘরে প্রবেশ করে দেখে সেখানে মনোময়ে তিন অতিথি বসে আছে, সবাই পানরত। মনোময় হুকুম করে পারমিতাকে অতিথিদের জন্য নাচতে হবে। অতিথিরা কুৎসিত ইঙ্গিতও করে পারমিতার প্রতি। হর্ষনাথও উপস্থিত সেখানে। বাধ্য হয়ে যখন পারমিতা নাচতে যাবে তখনই হর্ষনাথ দু-হাতে মুখ ঢেকে বেড়িয়ে যায় ঘর ছেড়ে। তারপর পারমিতা আর নাচে নি। তার স্বামী কোথায় ? স্বামিকে সে ফিরে পাবে কিনা ? প্রায়ই মন্টু এ প্রশ্ন তাকে করত। সেই প্রশ্নের খেই ধরেই পারমিতার এই গল্পশেষ উক্তি। চমকপ্রদ এই শেষ উক্তিতে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বিধবা পারমিতা স্বামী হিসেবে হর্ষনাথকেই বেছে নিয়েছে। শেষ এই ছত্রেই লেখক বুঝিয়েছেন যে সম্ভোগেই স্বামীত্ব অর্জন করা যায় না, যে পুরুষ নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করে, বা রক্ষার চেষ্টা করে তাকেই একজন নারী স্বামীত্বে বরণ করে নিতে চায়।

সুবোধ ঘোষের অনেক গল্পের সমাপ্তিই চমকহীন। বেশ কয়েকটি গল্পে লক্ষ্য করা যায় যে কাহিনী শেষ হয়ে যাবার পর যেন একটি আলাদা স্তবক জুড়ে দিয়ে গল্পের সমাপ্তি রচনা করা হয়েছে। কিন্তু গল্প পাঠে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে এ ধরণের সমাপ্তি কখনো গল্পের বোঝা হয়ে ওঠেনি, বরং এ ধরণের সমাপ্তি গল্পগুলোকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। শিল্পমন্ডিত করে তুলেছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

ফসিল গল্পটি আমরা জানি। ধ্বসে যাওয়া খনির পীটে মৃত নারী-পুরুষের লাশের সঙ্গে শ্রমিক নেতা দুলাল মাহাতোর লাশও খনি গহ্বরে নামিয়ে দেওয়া হল। এখানেই কাহিনী শেষ হয়েছে। তারপরই সংযোজিত হয়েছে শেষ স্তবক —

> লক্ষ বছর পরে, এই পৃথিবীর কোন এক জাদুঘরে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখেছে কতগুলি ফসিল ! অর্ধপশুগঠন, অপরিণতমস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তদের সাব-হিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল, আর ছেনি, হাতুড়ি গাঁইতা; কতগুলি লোহার ক্রূড কিম্ভুত হাতিয়ার। অনুমান করছে তারা, প্রাচীন পৃথিবীর একদল হতভাগ্য মানুষ বোধ হয় একদিন আকস্মিক কোন ভূ-বিপর্যয়ের কোয়ার্টস আর গ্রানিটের গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখেছে, শুধু কতগুলি সাদা সাদা ফসিল, তাতে আজকের এই লাল রক্তের কোন দাগ নেই।[২০]

জতুগৃহ গল্পে বিবাহ বিচ্ছেদের সাত বছর পর শতদল আর মাধুরীর হঠাৎ দেখা হয়েছে রাজপুর স্টেশানের ওয়েটিংরুমে। অপ্রস্তুত অবস্থা কাটিয়ে দুজনে কুশল বিনিময় করেছে, একান্তে কথা বলতে গিয়ে কখনো আবেগ-বিহ্বল হয়েছে, একসঙ্গে চা খেয়েছে, তারপর দুজন আবার প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে হেঁটেছে দুই বিপরীতমুখী গন্তব্যের ট্রেন ধরতে। কাহিনী শেষ। কিন্তু তারপরেও সুবোধ ঘোষ সমাপ্তির স্তবকে লিখেছেন —

> ওয়েটিংরুমের টেবিলের উপর একটি ট্রে, তার ওপর পাশাপাশি দুটি শূন্য চায়ের পেয়ালা। কোথা থেকে কারা দু'জন এসে, আর পাশাপাশি বসে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে চলে গেছে। রাজপুর জংশন আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে বয় এসে তুলে নিয়ে যাবে, ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রেখে দেবে, একটা পেয়ালা কাবার্ডের এই দিকে, আর একটা হয়তো একেবারে ঐ দিকে।[২১]

সুবোধ ঘোষের গল্পে চমকহীন সফল সমাপ্তির আর একটি উদাহরণ 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ'। এই গল্পে ভারতীয় আদিবাসীদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের অভিযানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে কি ভাবে আদিবাসীরা নিজভূমে বৃটিশ শাসকের প্রত্যক্ষ মদতে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের চক্রান্তের শিকার হয়েছে, কি ভাবে আপোসহীন সংগ্রাম করেও আদিবাসীরা পরাজিত হয়েছে। এই গল্পের গঠণের মধ্যে অরুণ রায় দেখেছেন একটা গণিতের ছক 'উল্টো করে দুটি ত্রিভূজ বসিয়ে দিলে ছয়মুখী তারার মতো যা দেখতে লাগে'। ধর্মান্তরের চক্রান্তের কাছে পরাজিত হয়েছে গল্পের নায়ক স্টিফান হোরা আর চিরকি মুরমুর প্রেম। বিয়োগান্ত এ কাহিনীটি শেষ হয়েছে বিরসাইট স্টিফান হোরা থানায় হাজিরা দিয়ে যাবার পর। কিন্তু কাহিনী শেষ হয়ে যাবার পরে লেখক সমাপ্তিতে যে স্তবকটি উপহার দিয়েছেন তাতে নতুন কোন চমক না থাকলেও গল্পটিতে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

> কাউকে মুখ ফুটে বলতে লজ্জা করবে, একটা ভুলের স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য কাঁটার মতো মনের মধ্যে বিঁধছিল। হয়তো আমরাই একেবারে নিরপেক্ষ

থেকে চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে স্টিফানকে হারিয়ে দিয়েছি। আর স্টিফানও সেই পরাজয়ের দু:খে বনবাসে চলে গেল।[২২]

গল্পের এই শেষ অংশটুকুতেই একবার মাত্র গল্পের শিরোনাম 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' উল্লেখিত হয়েছে। ইংরেজ ধর্মযাজকদের চক্রান্ত ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের যে অসম যুদ্ধের কথা আদ্যান্ত গল্পে বর্ণিত হয়েছে, লেখক সেই অঘোষিত যুদ্ধকেই – 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' আখ্যা দিয়েছেন। ইতিহাস তিনটি পানিপথ যুদ্ধের সাক্ষ্য দেয়। প্রথম যুদ্ধে পাঠানরা বাবরের কাছে পরাজিত হয় রাজপুতরা নিরপেক্ষ থাকায়, দ্বিতীয় যুদ্ধে পাঠানরা আবার আকবরের কাছে পরাজিত হয় তৃতীয় শক্তি নিরপেক্ষ থাকায় এবং তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তি পরাজিত হয় আহমেদ শা আবদলির কাছে রাজপুতরা নিরপেক্ষ থাকায়। সুবোধ ঘোষের মতে ইংরেজের কাছে আদিবাসীরা পরাজিত হয় বাঙালীরা নিরপেক্ষ থাকায়। তিন তিনটি পানিপথের যুদ্ধে প্রভাবশালী তৃতীয় পক্ষের নিরপেক্ষতার সঙ্গে, আদিবাসীদের সংগ্রামে বাঙালীদের নিরপেক্ষতার এক অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েই সুবোধ ঘোষ আদিবাসী সংগ্রামের পরাজয়ের ইতিহাসকে 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' বলেছেন। গল্প শেষে আদিবাসীদের প্রতি বাঙালীর উন্নাসিকতার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বাঙালী পাঠককে আত্মসমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে।

স্নানযাত্রা গল্পের নায়ক আদর্শনিষ্ঠ সমাজসেবী ইন্দুনাথ। তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পতিতা সোনালী নিজেকে পূর্ণিমাতে রূপান্তরিত করেছে। গল্পের শেষভাগে আবার ইন্দুনাথই পূর্ণিমাকে সোনালী বেশেই একান্তে পেতে চেয়েছে। পূর্ণিমার কাছে ধরা পড়ে যায় চটকদার আদর্শের আড়ালে পুরুষ ইন্দুনাথের ভীরু লালসার রূপ। মোহভঙ্গ হয় তার। ইন্দুনাথকে পালাবার পথ দেখিয়ে দেয় সে কারণ, ইন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী চিরঞ্জীব আসবে তার ঘরে। পূর্ণিমা অনুরোধ জানায় ফিরে গিয়ে ঘরে ঢুকবার আগে যেন স্নান করে নেয় ইন্দুনাথ। কাহিনী এখানে শেষ হলেও সমাপ্তির স্তবকে সুবোধ লিখেছেন —

> চমকে ওঠে ইন্দুনাথ। যেন একটা সাপের ছোবল পড়েছে ইন্দুনাথের বুকের উপরে, চওড়া একটা বাজে বুক, বটেশ্বরপুরে এসে যে বুকের সাহস ভীরু হয়ে গেল, আর দু:সাহসী হয়ে উঠল ভীরুতা। এক মুহূর্তও দেরী না করে, সরু পথের অন্ধকারের সঙ্গে একটা ভীরু ছায়ার মত ছটফট করে মিশে গেল ইন্দুনাথ।[২৩]

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের সমাপ্তি প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। বেশ কিছু গল্পের সমাপ্তির বাক্যটিতে একটি বিদায়ের ছন্দ ধরা পড়ে। এটা তাঁর একটা নিজস্ব ধরণ। অন্তত: ত্রিশটিরও বেশি গল্পে এই লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি 'চল' শব্দটি বিভিন্ন প্রত্যয়যোগে ব্যবহার করেছেন। যেমন – 'তবে চল লেখাটা মুছে দিয়ে আসি, (মনভ্রমরা), 'সকাল না হতেই নতুন ঘরে চলে গেল' (সুনিকেতা), 'নীল রঙের জামা কিনতে চলে যায় নরেন' (মায়ামানিক), 'রেণু বলে – চলো নেমে যাই' (রামগিরি), 'তারপরই বলেন – আমরা এবার যাই' (ব্রততী), 'একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে চল' (তৃষিত মরু), 'কোন কথা না বলে চলে গেল অধীর' (কোন কথা না বলি), 'তবু চলে গেলেন ? কী আশ্চর্য – কিছুই যে বোঝ যায় না' (গুহামানব), 'চোরের আবছায়া মিলিয়ে গেল ধোঁয়া হয়ে' (উচলে চুড়িনু), 'ঘর থেকে বের হয়ে পথের শোভাযাত্রার সঙ্গে মিশে যায় তপেশ' (ক্ষণকালীন), 'আচ্ছা – আমি এবার চলি মিসেস ঘোষ' (নিতসিঁদুর), 'বাবার সমাধিতে ফুল দিতে চল' (বৈপিত্রিক), 'না বৌদি, এই ট্রেনেই চলে যাই' (মানবিকা), 'জীবন ছেড়ে পালিয়ে যায় বলেই ওরা লেখক' (অনধিকার প্রবেশ), 'গরম দুধটা এখুনি খেয়ে নিন, তার পর চলুন' (কোন মিল নেই তবু), 'যান না আমিও তো একটু পরেই কাকাকে সঙ্গে নিয়ে আসছি' (নায়িকা মুগ্ধা), 'এতদিনে আবার স্বামীকে পেয়ে

স্বামীর কাছে চলে গিয়েছে' (পারমিতা), 'হুহু করে ছুটে চলে গেল গাড়িটা (সাধ না মিটিল) 'সরু পথের অন্ধকারের সঙ্গে একটা ভিরু-ছায়ার মত ছটফট করে মিশে গেল ইন্দুনাথ' (স্নানযাত্রা), 'আর স্টিফানও সেই পরাজয়ের দু:খে বনবাসে চলে গেল – হ্যাঁ, বেশ কষ্ট হয়েছে। আমি এখন চলি' (চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ), 'দুজনে সেই সন্ধ্যাতেও একসঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে আর হেসে হেসে গল্প করতে করতে তাজ রোড ধরে এগিয়ে যেতে থাকে' (আগ্রা আর লখনউ), 'যত বন্ধ্যা মাটির ঢেলা অবহেলার মাড়িয়ে ওরা একদিন চেলে যায়-ওরা বাঁধা পড়ে না কোথাও' (যাযাবর), 'আর বুঝতে হবে না, চা খাবি চল' (পুষ্পকীট), 'ইমাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে হবে না, চা খাবি চল' (পুষ্পকীট), ইমাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায় হেমেন' (পরভৃতা), 'সুশান্ত বলে – চলো ভেতরে যাই' (ছায়া ও কায়া), 'আসর ছেছে চলে যাচ্ছেন এক ভদ্রলোক আর এক মহিলা, কিরকম যেন ওদের দুজনের চলবার আর তাকাবার ভঙ্গি, মনে হয় একেবারেই ম্যানার্স জানে না (থির বিজুবী), 'একটা দস্যুর মতো চলে গেল ছেলেটা' (বর্ণচোরা)।

সুবোধ ঘোষের গল্পের সমাপ্তি যেমন শৈল্পিক তেমনই ইঙ্গিতপূর্ণ। অমিতাভ চৌধুরীর মন্তব্যে আমরা পূর্বেই জেনেছি, প্রতিটি গল্পের পেছনেই লেখকের এক সুষ্ঠ পরিকল্পনা থাকত। তিনি গল্প শুরু করতেন শেষ থেকে। সুবোধবাবু কখনও গল্পের শীর্ষবিন্দু রচনা করছেন সমাপ্তিতে, আবার কখনও কাহিনী শেষ হয়ে যাবার পর, কাহিনী বর্জিত একটি প্যারা শেষে রচনা করে গল্পটিকে এক নতুন মাত্রা দান করেছেন। সুবোধ ঘোষের গল্প সমাপ্তির এক চমককে 'স্টান্ট' এবং চমকহীন ইঙ্গিতপূর্ণ সমাপ্তিকে 'লোক ঠকানো মোচড়' বলা সঙ্গত মনে করেন না নীরেন্দ্রনাথ।

> আমরা যখন কলেজের ছাত্র, তখন কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, এবং কথাটা আমরা বিশ্বাসও করেছি যে, সুবোধ ঘোষের প্রায় প্রতিটি গল্পের শেষে একটা স্টান্ট বা লোক-ঠকানো মোচড় থাকে, এবং গল্পকার হিসেবে ওটাই হচ্ছে তাঁর প্রধান অস্ত্র। কিন্তু বয়স ও অভিজ্ঞতা আর একটু বাড়তেই আমরা বুঝে যাই যে, যাকে আমরা মোচড় ভাবতুম, আসলে সেটা আরও বড়-কিছু।[২৪]

ছোটগল্পের জগতে সুবোধ ঘোষ একজন কুশলী এবং বুদ্ধিদীপ্ত লেখক। জীবনকে তিনি দেখেছেন নানা দৃষ্টিকোন থেকে। মানুষের প্রেম-ভালবাসা এবং নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন একজন মনোবিজ্ঞানীর সতর্কতায়। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তিনি প্রেম-ভালবাসাকে সবরকম কলুস মুক্ত করে মহিমান্বিত করেছেন। জীবনকে ভালবাসার সৌরভে সুরভিত করেছেন। লক্ষ্য করার মত বিষয়, এ ধরণের প্রেমের গল্পেও সুবোধ ঘোষ বিষয় নির্বাচনে, সৃষ্ট চরিত্রের কথোপকথনে, ব্যবহৃত ভাষায় সর্বদাই এক ধরণের, আভিজাত্য সম্ভ্রম ও রুচি বজায় রেখেছেন, যা তাঁর গল্পকে এক উঁচু মানে পৌঁছে দিয়েছে। সুবোধ ঘোষের কোন একটি গল্প আগাগোড়া বিশ্লেষণ করলেই তাঁর রচনার আঙ্গিক প্রকরণ এবং নিপুন শিল্পকর্ম সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি। এই বিশ্লেষণের প্রয়োজনে জতুগৃহ গল্পটিকেই বেছে নেওয়া হল।

জতুগৃহ গল্পের আরম্ভ এবং সমাপ্তি বেশ কৌশলপূর্ণ। এখানে গল্পের দ্রুমমস্রৎ এবং তার বিষয় অত্যন্ত ঘনিষ্ট। দু'জন মানুষ দুটি ট্রেনে একটি Platform এ এসে উপস্থিত হয়েছে। তারপর এক কালের স্বামী স্ত্রীকে একই ওয়েটিংরুমে বসিয়ে সম্পর্কের পরীক্ষা করেছেন লেখক। সেই পরীক্ষার প্রথমে এসেছে পরস্পরের আন্তরিকতার একটি ছবি। চোখের জল এসেছে দু-ভাবে।

১। 'মাধুরী রায়ের অলেস্টারে কুচিকুচি জলের ফোঁটা নি:শব্দে চিক চিক করে।

২। 'শতদল দত্তও জলে ভেজা চশমার কাচ মুছে নিতে ভুলে যায়।

এ গল্পটিকে লেখক পরীক্ষা বলেছেন। সেই পরীক্ষার জন্য গল্পের দ্রুমমন্ত্রং হয়েছে ওয়েটিংরুম যাকে একটা দূরবর্তী চিত্রকল্পে এই সংসারও বলা যায়। জতুগৃহ গল্পটার কথনভঙ্গি সর্বজ্ঞ লেখকের মুখ দিয়ে বলানো। লেখকই বক্তা। কিন্তু দ্রুমমন্ত্রং খুব কাজে লেগেছে। স্টেশনের ওয়েটিংরুমে দুটো মানুষ নিজেদের পুরানো পরিচয় আবার ঝালিয়ে নেবার, সুযোগ পেয়েছে। লেখক একে বলেছেন সম্পর্কের পরীক্ষা।

প্রথমে দুজন দুজনকে দেখামাত্র একটা অস্বস্তি একটা সংকোচ কাজ করে। তারপর সেই সংকোচের বিপরীত ধাক্কাতেই শতদল স্থির হয়ে বসে। এখানে প্রথম দিকের ক্রিয়াটা তারই। সেই চলে যেতে চায়। সংকোচের প্রবলতায় কুলিকে ডাকে – তার ডাকে এসে উপস্থিত হয় ওয়েটিংরুমের বয়। শতদল তাকে চা দিতে বলে।

এইটুকু বর্তমান। এই বর্তমানের মধ্যেই লেখক সম্পর্কের অতীতটা বুনেছেন – দুজনের সম্পর্কের ইতিহাস বলে। বিচ্ছেদের কথাতেই আসে সম্পর্কের কথা। এখানে দুজনের ভাবনাতেই এসেছে অজস্র আলোর উপমা – কিন্তু নিতান্ত অনর্থক অর্থহীন সে আলো তাদের বিগত সাত বছরের জীবনের সম্পর্কহীনতার দিকেই তাদের ঠেলে দিয়েছে।

এরপর লেখক সংবাদ দিয়েছেন দুজনেই আবার বিয়ে করেছে। এটা তাদের বর্তমান জীবন। তবু তারই ভেতরে জেগে আছে তাদের সেই পুরানো বিবাহিত জীবন। লেখক ধীরে ধীরে সেই জীবনের অন্দরে প্রবেশ করেছেন।

কীভাবে বর্তমান থেকে সেই অতীত জীবনের অন্ত:পুরে পৌঁছানো যায়? শতদল ওয়েটিংরুমে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যেন তার বর্তমানকে ভুলে যায়। আর সেই ভুলে যাওয়া মন নিয়ে সে মাধুরীকে দেখে। এ এক নূতন মাধুরী। অনাদি রায়ের গড়া মাধুরী।

এই মাধুরীর চিন্তা থেকে সে আবার ফিরে আসে বর্তমানে। সাবান তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে যায়। এটা মাধুরীর চিন্তা থেকে শতদলের সরে যাওয়া। সেই অনুভব থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা।

এবার উঠে আসে মাধুরীর দিকের অনুভব। মাধুরী এতক্ষণ ক্রিয়ায় ব্যক্ত হয়নি। তার কথা বলা হয়নি। এতক্ষণ যা কিছু অনুভূতি তা শতদলের। এবার মাধুরীর কথা। মাধুরী শতদলকে দেখে আয়নায় প্রতিবিম্বিত। শতদল তন্দ্রার রেশে যেন বর্তমানকে ছাপিয়ে গিয়েছিল আর মাধুরী বর্তমানের শতদলকে আয়নায় প্রতিবিম্বিত দেখে যেন অতীতের স্মৃতিকেই খুঁজছিল। তাই শতদলের জিনিসপত্রে পাঁচ সাত বছর আগের স্মৃতিচিহ্ন ইর্ষায় তার ভুরু দুটি সর্পিল হয়ে উঠেছিল।

এই পর্যন্ত যা কিছু সবই দুজনের ভাবনা। কোন প্রত্যক্ষ কথোপকথন নয়। সম্পর্কের অতীত নিয়ে তারা নিজেদের মত ভাবছে – ভাবনায় উঠে আসছে অতীতের দিনগুলি। কিন্তু লেখক এরপর ভাবনার ভিতর থেকে বাস্তবের সম্পর্ককে আমাদের সামনে আনলেন।

শতদল খাবারের বাটিগুলো বের করে টেবিলে রাখে, নিজের হাতে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিতে যায়। আর তখনই মাধুরীর প্রতিক্রিয়া ক্রিয়ায় ব্যক্ত হয়ে ওঠে। এ দৃশ্যও সে দেখে আয়নায়। আর সেই আয়নায় দেখা জগৎ থেকে যেন অকস্মাৎ একটা প্রতিক্রিয়ায় সে বাস্তবে নেমে আসে। কেউ কারো সম্পর্কে এ পর্যন্ত কথা বলেনি। এতক্ষণ লেখক প্রতীক্ষায় ছিলেন কীভাবে উভয়ের মৌনতা ভেঙে বর্তমান সম্পর্কের বাস্তব অবস্থাটা প্রকাশ করবেন।

এবার সেই নীরবতার ভেতর দিয়ে জেগে উঠলো ক্রিয়া। শতদলকে নিজের হাতে জল গড়িয়ে

নিতে দেখে মাধুরীর প্রতিকৃয়া ব্যক্ত হলো। সেই প্রথম কথা বলল মাধুরী – ও কি হচ্ছে ? এটা মাধুরী ইচ্ছে করে বলে নি। হঠাৎই বেড়িয়ে গিয়েছে মুখ দিয়ে। সাত বছরের পুরানো দাম্পত্য জীবনে অভ্যস্ত আরচরণের এক অপরিকল্পিত প্রকাশ। এখান থেকেই আসে বর্তমানের সম্পর্কের পরীক্ষা।

এর পর এলো দুটো প্রতীক, কিন্তু ভিন্নমুখী।

১। রাজগীর আর কলকাতার ভিন্ন পথগামী দুটি ট্রেনযাত্রীর কথা।

২। ট্রের উপর দুটি চায়ের পেয়ালা সাজিয়ে আনে বয়।

এই হল এ গল্পের দ্বান্দ্বিক বুনন। গল্পের মধ্যে যেন দুটো স্তর। একটি স্তরে বর্তমানের বাস্তবতা আর অতীতের স্মৃতি মেদুরতা, আর অন্য স্তরে দুজনের ভাবনার একটি দ্বন্দ্ব। আর এই দ্বন্দ্বই তাদের সম্পর্কের অতীত বর্তমানের দ্বান্দ্বিকতাকে ফুটিয়ে তোলে।

শতদল মাধুরীর হাত চেপে ধরে জানায় সে এখনো তাকে ভোলেনি। শতদলের কথার উত্তরে মাধুরী বলে তা সে চোখে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু শতদলের প্রশ্নের উত্তর মাধুরীর নানা আচরণের মধ্যে ছড়ানো থেকে যায়। কিন্তু শতদল স্পষ্ট উত্তর চায়। সে স্পষ্ট ক্রিয়ায় নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তার কথা জানায়। কিন্তু মাধুরীর উত্তর থাকে অনুচ্চারিত। 'শুধু দু চোখের কোনে ছোট ছোট মুক্তা কণিকার মত দুটি সজলতার বিন্দু জেগে ওঠে'।

দু-জনের ভাবনা আর এই অতীতচারণের মধ্যে এবার আসে বর্তমানের অন্য জীবনের বাস্তবতা। অনাদি রায় এবার গল্পে এসে ঢোকে। আর সেখানেই শতদল দেখতে পায় মাধুরীর বর্তমানকে। সেখানেই শতদলের মনের মধ্যে গল্প আবার ভাবনাবীজ হয়ে ঢুকে পড়ে। গল্পের যে দ্বান্দ্বিকতা এবার সেখানে শতদলের নীরবতার ভূমিকা। গল্প শেষের দিকে এগিয়ে যায়। শতদলের প্রশ্নের উত্তর কিন্তু তখনো মেলেনি। কিন্তু মাধুরীকে দেরী করিয়ে দেবার সময় তার নেই।

এখানে একটি সুন্দর উপমা এনেছেন লেখক। 'স্বয়ংবর সভায় মাধুরীর বরমাল্য পেয়ে চলে যাচ্ছে অনাদি আর ভগ্নবাহু প্রতিদ্বন্দ্বির মত পড়ে আছে শতদল'।

তবু শেষ পর্যন্ত মাধুরী উত্তর দিয়ে যায়। যাবার আগে সুধাকে নিয়ে শতদলকে রাজগীরে বেড়াতে যাবার নিমন্ত্রণ করে। এ নিমন্ত্রণের কারণ জানতে চাওয়ায় মাধুরী শতদলকে বলে – 'আমাকে একটা তামাসা দেখাবার সুযোগ তোমরাও পাবে'। তখন 'এইরকম মিছিমিছি রাগ করে কতগুলি বাজে কথা বলবো'।

গল্পে এখানেই সম্পর্কের পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়। তার পর থেকে শেষের পরের সমাপ্তির কথা। আর সেখানেই আসে দুটি কাপের প্রতীকীয়তায় দুই ঘনিষ্ট মানুষের সম্পর্কের বর্তমানতা।

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের অন্য একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাষা। যদিও তাঁর গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই সমাজের মধ্যবর্গ এবং নিম্নবর্গের মানুষ, তবুও তিনি অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃতধর্মী তৎসম শব্দ প্রয়োগ করেছেন। আবার প্রয়োজনবোধে নীচুতলার মানুষের অমার্জিত কথ্য ভাষাও ব্যবহার করেছেন তিনি। সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে সুবোধ ঘোষের নিজস্ব অভিমত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

> সাহিত্যগত ভাষার যে রসগুণকে আমরা কাম্য বলে মনে করি, তার ভিত্তি রয়েছে ব্যবহৃত শব্দ ও তার ধ্বনিগুণের ওপর। ভাব ও অর্থ পরের কথা। ভাষার রূপই হলো সবচেয়ে বড় ও আদি প্রয়োজন। এখানেই যদি ত্রুটি থেকে যায়, তবে তাকে আর সাহিত্যের আসরে স্থান পেতে হবে না।[২৫]

লেখকের তৎসম শব্দ সমৃদ্ধ কয়েকটি গল্পের অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করছি।

ক ) এক অভাবিত গৌরবে আজ দিলীপের কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। ফৌজী কৌলিণ্যের ফুলের মুকুটটি যে বিমানসেনা দিলীপ, আজ সেই সেরা পদ ও পংক্তির সম্মান গ্রহণ করতে আহ্বান-লিপি পেয়েছে। (বৈরনির্যাতন)

খ) কোথায় তুমি হরগৌরী, পার্বতী পরমেশ্বর ! সেই অঙ্গে অঙ্গে বাঁধা রূপ। অর্ধ অঙ্গে কস্তুরীচন্দন, অর্ধ অঙ্গে শ্মশানভস্ম, অর্ধাঙ্গে মন্দারমালা, অর্ধাঙ্গ করোটিমালা – অর্ধাঙ্গে দিব্যাম্বর, অপরার্ধ উলঙ্গ। অর্ধাঙ্গ স্বর্ণচম্পকের বর্ণ, অপরার্ধ কর্পূরধবল – অর্ধাঙ্গে মেঘশ্যামল কুন্তল, অপরার্ধে বিভূতি-ভূষিত জটা। শিবার অর্ধ এবং শিরার অর্ধ নিয়ে রূপের ঈশ্বর এই মূর্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। (শিবালয়)

গ) কৃষ্ণশিলায় গড়া উত্তমদশতাল ধ্রুবরের মূর্তি। বিক্রমখচিত আয়তস্র বেদীর ওপর ভোগশয়ান চতুর্ভুজ বিষ্ণু। ডানহাতে পদ্ম, বামহাতে কটকমুদ্রা। নীলোৎপল হাতে ভূমিদেবী বসে আছেন বাঁ পায়ের কাছে। একটু দূরে আদিশেষ নাগের বিষাক্ত নিশ্বাসে জর্জর মধু ও কৈটভ, হিংস্র ভ্রুকুটিকুটিল চোখের দৃষ্টি। দক্ষিণশীর্ষ জয়দ বিষ্ণু – গলায় বিলম্বিত বৈজয়ন্তী শোভা, বুকে শ্রীবৎস ও কৌস্তভ। ব্যালোল কেয়ূরে মকরকুন্ডলেও করণ্ডমুকুটে শোভিত সৃষ্টিধর। এক বিরাট পাষাণের মহাকাব্য ! মন্দিরগাত্রের চিত্রার্ধগুলি এখনও অক্ষত এক একটি ছন্দোবদ্ধ মহিম্ন স্তর যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কিছুক্ষণের জন্য। (ন তস্থৌ)

ঘ) এই সেই গন্ডোয়ানা ভূমি যেখানে গলিত প্রস্তরের নিশ্বাস শূন্যে মিলিয়েছে একদিন। যে পরমাণুর যজ্ঞে সৃষ্টি হলো হীরা, পান্না, পোখরাজ, নীলা, পদ্মরাগ। প্রথম প্রেমে মরণাহত কত অতিকায় গোধিকার চুম্বন আঁকা আছে এই পাষাণে পাষাণে। (উচলে চড়িনু)

সংস্কৃতধর্মী শব্দ প্রয়োগে পারঙ্গম এই সুবোধ ঘোষই আবার বিভিন্ন গল্পে অমার্জিত কথ্য ভাষার যথোপযুক্ত ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হ'ল।

ক) – শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে (সুন্দরম)

খ) – এ কি ? তুই ধনিয়া ?
– হ্যাঁ চাচা। আমার জাত নেই, আমি নাকি রান্ডি !
– ছি ছি, এ কি বলছিস।
– হ্যাঁ চাচা, আমাকে নাম লেখতে হয়েছে। কাল থেকে বাজারে থাকতে হবে।
– আর না, তুই তো লছ্মী।
– না চাচা, আমার স্বামী নেই।
– কোন গাইয়ের স্বামী নেই, তারা কি লছ্মী নয় ?
– তা বল্লে চলে না, আমি তো গাই নই। (পরশুরামের কুঠার)

গ) কিন্তু গোপীকে আটকাতে পারলাম না। আমারও চোখে পড়লো, বউ ধর্ম খারাপ করে এসেছে। চেহারা দেখেই সব বুঝে ফেললাম। মূর্ছা গেলাম আমি। বুড়ি ঢোঁক গিলে চোখ বন্ধ করে খানিক্ষণ বিঝুম হয়ে রইল। মূর্ছার মতই মনে হ'ল। হাবিলদার চেঁচিয়ে বললো-এই বুড়িয়া, সামলে। চোখ খুলে

বুড়ি আরম্ভ করলো — জেগে উঠে দেখি, কাটামরা বউয়ের বুকে চড়ে হাবা মাই খাচ্ছে। গোপী পালিয়েছে। (দন্ডমুন্ড)

ঘ) প্রায় দশ-বারজন একসঙ্গে কোদালের হাতল চেপে গর্জে উঠলো- কি বললি রে বুড়ো ? তোর জবা হলো মেয়েমানুষ ? আর হোই যে এতগুলি বিটি মাগ মাতারী খাটছে, ওরা মেয়েমানুষ লয় ? যা ঘরকে গিয়ে একবার দেখ। মোহন তাঁতী যে জাত লুটে নিচ্ছেরে কানা বুড়া। দেখ গিয়ে যা। (তমসাবৃতা)

ঙ) আমার মান বাঁচিয়েছ। তোমাকে বখশিস দেব। আসছে বছর কাশ্মীর। কিন্তু..... কিন্তু তুমি আমাকে এই মাত্র অসভ্য বলেছ। ইউ ভ্রষ্টা মুড়িওয়ালীর বাচ্চী। তোমাকে আমি জুতিয়ে....।'' (বারবধূ)

চ) ফিক করে হেসে ফেলে লতা। প্রসাদের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলে-ডুডু খাবে খোকা ? ভদ্দরলোকের ভয়ে বুক দুর দুর করে, মেয়েমানুষ রাখার শখ কেন ? (বারবধূ)

বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের মেলবন্ধনের প্রয়োজনে সুবোধ ঘোষ এভাবেই তাঁর ছোটগল্পে সুচিন্তিতভাবে ভাষার তারতম্য ঘটিয়েছেন এবং এর ফলেই গল্পগুলো অনিন্দসুন্দর হয়ে উঠেছে। বাংলা ছোটগল্পে অনেক লেখকই মানুষের মুখের অপরিমার্জিত ভাষা ব্যবহার করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সুবোধ ঘোষ যে ভাবে তাঁর ছোটগল্পে তৎসম শব্দের পর্যাপ্ত প্রয়োগ উপভোগ্য ধ্বনি মাধুর্যের সৃষ্টি করেছেন, তার উদাহরণ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এখানে তিনি স্বতন্ত্র। এই প্রসঙ্গেই প্রমথনাথ বিশী বলেছেন —

> বাংলা সাহিত্যে যখনই ক্লাসিকাল রস সৃষ্টি করিয়াছেন তখনই এই ভাষারীতিকে গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। ইদানীংকালে অধিকাংশ লেখক সে প্রয়োজন অনুভব করে না, তাই অ-ব্যবহারে, অপরিচয়ে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেই অজ্ঞানে এহেন ভাষারীতি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। ভাষার একটি নিজস্ব মহিমা আছে, ভাষা কেবল ভাবের বাহন নয়।[২৬]

একটু লক্ষ করলেই মেনে নিতে হয় যে সুবোধ ঘোষের শব্দ-চয়নের ক্ষেত্রটি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত। একদিকে তিনি সাধারণ মানুষের কথ্যভাষার শব্দগুলিকে সরাসরি উপস্থাপিত করেছেন, অন্যদিকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে তৎসম এবং সংস্কৃত ঘেঁসা শব্দেরও বহুল প্রয়োগ করেছেন। এ ধরণের শব্দ শুধুমাত্র গল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, গল্পের শিরোনামেও এই বিশেষ ধরণের শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তিনি। যেমন, মা হিংসী, মধুরেণ সমাপয়েৎ, স্বমহিমচ্ছায়া, সুন্দরম্, কাঞ্চনসংসর্গাৎ, ন তস্থৌ এবং স্বস্ত্যয়ণ।

সুবোধবাবু তাঁর ছোটগল্পে ইংরেজী শব্দেরও ব্যবহার করেছেন অবাধে। বাংলা শব্দভান্ডারে অনেক ইংরাজী শব্দই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। বেশ কিছু ইংরেজী শব্দ বাংলা ভাষায় যথেষ্ট ব্যাবহৃত হওয়ার কারণে মূল বাংলা শব্দটিই অপ্রচলিত হয়ে গেছে সন্দেহ নেই। কাজেই বাংলা ছোটগল্পে প্রচলিত ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ নতুন কোন ঘটনা নয়। গল্পে বর্ণিত চরিত্র, বিষয় এবং পরিবেশের কারণে অনেক বাঙালী সুলেখকই নিজ নিজ গল্পে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছেন, সুবোধ ঘোষও করেছেন। এ পর্যন্ত সুবোধ ঘোষকে আলাদা করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

কিন্তু সুবোধবাবুর গল্প যখন শুধু চরিত্রের মুখে নয়, লেখক হিসেবে নিজের বর্ণনাতেই বাংলায়

বহুল প্রচলিত ইংরেজী শব্দ তালিকার বহির্ভূত বেশ কিছু ইংরেজী শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তখনই সুবোধ ঘোষের স্বতন্ত্রতার প্রশ্ন উঠে আসে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সুবোধ ঘোষ তাঁর চারটি ছোটগল্পের নামকরণ করেছেন ইংরেজী শব্দ দিয়েই। – 'শক থেরাপী', অর্কিড, কোটেশন এবং ক্যাকটাস। যেহেতু এখানে লেখকের ছোটগল্পে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দমালার পূর্ণ তালিকা পেশ করা সম্ভব নয়, সেহেতু কিছু উদাহরণ সহযোগে এই বিশেষ ক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষের স্বাতন্ত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ক) 'রাজীবের চেনামহলের এমন কেউ ছিল না, যে একবার টেলিফোন করে রাজীবকে *কনগ্র্যাচুলেশন* জানায়নি। *হাউসমেড* বুড়ি লুইসার আশি বছুরে থুড়থুড়ে বাবা পিটার্সও রাজীবকে টেলিফোনে জানিয়েছিল – *থ্যাঙ্ক গড*, আপনি আজ *প্রাউড ফাদার অব এ সন*।' (জয়ন্তী)

খ) 'ছবিটা আজ ওদের *ফ্লাটের* বাইরে *লাউঞ্জের* একটি চমৎকার *ইন্টিরিয়র ডেকোর* মাত্র।' (জয়ন্তী)

গ) 'মুক্তি আজ তার সবচেয়ে আদরের সাজটি পরেছে – *সান ফ্লাওয়ার ডিজাইনের স্কার্ট*, তার উপর *লাইল্যাক শেড; জ্যাকেটের* রং *লবস্টার রেড*।' (জয়ন্তী)

ঘ) 'এরা *গভর্ণমেন্টের* কাছে থেকে বড় বড় *ব্রিজ* তৈরী করার *কনট্রাক্ট* নিয়ে থাকে।' (দন্ডমুন্ড)

ঙ) '*প্যারেডে* প্রাইজ পাওয়া গোটা দশেক *মেডেল* বুকের ওপর *পিন* দিয়ে ঝুলিয়ে, ফিটফাট উর্দি *বুট বেল্ট* পট্টির সাজ, পরে, *স্যালুট* দেগে *ক্যাশিয়ারবাবুর কাউন্টারে* এসে দাঁড়ায়।' (দন্ডমুন্ড)

চ) 'শেষে তাই হতে চললো। *দোজ হু কেম টু স্কার্ফ রিমেনড্ টু প্রে*।' (হৃদঘনশ্যাম)

ছ) 'রুণুর হাতের বাটিকের কাজ তিনবার *এগজিবিশন কমিটির সার্টিফিকেট* পেয়েছে।' (জীবনে তোমার পরিচয়)

জ) '**এয়ারফিল্ডের ট্যাক্সি-ট্রাকে** তখনও জ্বলছে **গুজ-নেক ফ্লেয়ার**।' (মায়াকুহেলী)

ঝ) '*ফগ* গলে গিয়েছে, *ভিজিবিলিটি* অতি চমৎকার।' (মায়াকুহেলী)

ঞ) 'অনুকুলবাবু এই অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো *কনট্রাকটর*। তাঁর *টিম্বার ইয়ার্ড* লম্বায় প্রায় এক মাইল।' (দিগঙ্গনা)

ট) 'মস্তিষ্কের *প্যারালিসিস* নয়, স্মৃতিবিলোপ কি না তাও *স্পেশ্যালিস্টরা* জোর করে বলতে পারছেন না। **লস অব** *নার্ভ* বলেও মনে হচ্ছে না। খুবই জটিল রকমের *ইনস্যানিটি*।'(দিগঙ্গনা)

বিভিন্ন গল্পে কখনো সৃষ্ট চরিত্রের মুখে কখনো বা উত্তম পুরুষে লেখক নিজেই যে ইংরেজী শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করছি। উল্লেখিত এই শব্দগুলো প্রাইমা পাব্লিকেশনস এর পাঁচখন্ডে প্রকাশিত 'সুবোধ ঘোষ এর গল্প সংগ্রহ'র দ্বিতীয় ও পঞ্চম খন্ডের গল্পগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে।

'সিটি, শেড্, সেলিং-এজেন্ট, ডিউটি, মার্চেন্ট, রিক্রুটার, পেন্ট, শো-রুম,

গ্যালারি, সেন্সাস, রেষ্ট, লেট, কংক্রীট, ইনক্রিমেন্ট, সিনিয়র, স্ট্র্যাটেজি, ট্রেনিং, স্কলার, প্যাডেল, লাউঞ্জ লেডি, ডক্টরেট, ডোন্ট, মার্কেট, আর্টিষ্ট, অর্ডার, অনার্স, প্রিভেন্ট, ষ্টল, কনস্ট্রাকশন, স্যার, পোজ, অফিসিয়েট, প্রেসটিজ, প্রসপেক্টাস, ইয়াংম্যান, হিষ্ট্রী, স্টাইল, স্টিক, চ্যারিটি, রিসার্চ, রিটায়ার্ড, সিফ্‌ট, ইন্ডিয়ান, স্টক, এটিকেট, ওভারম্যান, ওল্ড, টন, সুইসাইড, ডিউটি, জেন্টেলম্যান, প্ল্যানিং, পীকক, মেটাল, রিট্রিট, সিমপ্যাথি, ডিসট্যান্ট, হর্ণ, ক্যানিবাল্‌স্, কমিশন, সিগন্যাল, স্টেটমেন্ট, হাউস, ট্র্যারিস্ট, ক্রসিং, স্টোর, কালচার্ড, সার্ভিস, লেভেল, ফোরম্যান, সার্টিফিকেট, প্রোপ্রাইটর, ম্যানেজার, ফাস্ট, স্টেপ, কাওয়ার্ড, হিট, গ্রুপ, সুইং, জাম্প, এগ্রিকালচার, ডিগ্রী, জুয়েলারী, ডংকি, ইরিগেশন, পার্সেন্ট, স্টান্ড, কো-অপারেশন, নেটিভ — ইত্যাদি।

সুবোধবাবু প্রাসঙ্গিকভাবেই তাঁর ছোটগল্পে এই সব ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ এ সব শব্দ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মানুষের চরিত্রগত কথনভঙ্গী। ইংরেজী শব্দ না বলে এ সব ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ বসালে তা একটা কৃত্রিম বুলি হয়ে উঠতো।

সুবোধ ঘোষের গল্পের কথনভঙ্গীও লক্ষ্য করার মত। বেশ কয়টি গল্পে তিনি প্রথম পুরুষের প্রচলিত বর্ণনা-রীতি বর্জন করে উত্তম পুরুষে গল্প বলেছেন এবং এই পদ্ধতিতে গল্প বলতে গিয়ে কখনো কখনো নিজেই গল্পের একটি চরিত্র হয়ে উঠেছেন।

'চতুর্ভুজ ক্লাব'-এর চারজন সদস্য বিনু, দীপু, নুরু এবং লেখক নিজে। যাযাবর গল্পে ভবানীরূপে লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন দারিদ্র্যজর্জর নরেনবাবু বাড়িভাড়া মেটাতে না পেরে সপরিবারে স্থান থেকে স্থানান্তরে বাসা বদল করেন। তিন অধ্যায় গল্পেও লেখকের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ ভবনী নামেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সুবোধবাবু ভবানী পাঠক ছদ্মনামে আনন্দবাজার পত্রিকায় অনেক ফিচার-ধর্মী লেখা লিখেছিলেন। চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ গল্পে লেখকের আদ্যন্ত উপস্থিতি তাঁর প্রকৃত পদবী 'ঘোষ'-এ। 'ভাট তিলক রায়'-এ লেখক চরিত্র হিসেবে উপস্থিত থেকেছেন পূর্বাপর একজন দর্শক হিসেবে কিন্তু কোন নাম গ্রহণ করেন নি। এখানে লক্ষ্য করার মত বিষয় বেশ কিছু গল্পে লেখক উত্তম পুরুষে চরিত্র হিসেবে উপস্থিত থাকলেও কোন গল্পেই প্রধান চরিত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন নি। কাহিনীর সঙ্গে নিজেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জড়িয়ে রেখেছেন একজন দর্শক হিসেবে, ঘটনার গতি প্রকৃতি এবং পরিণতিতে নিজের উপলব্ধি ব্যক্ত করে নিজের বিশ্লেষণ এবং ভাবনায় পাঠকের ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে সুকৌশলে প্রভাবিত করেছেন।

গল্পের মধ্যে চরিত্র হিসেবে উপস্থিত থেকে মানুষের দোষ, ত্রুটি এবং অপরিণামদর্শিতার দিকে স্পষ্টভাবে লেখক অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন তাঁর পশু-প্রেম-প্রকৃতি বিষয়ক দশটি গল্পেই। গল্পগুলোতে লেখক পূর্বাপর একই রামতনু নাম নিয়ে উপস্থিত থেকেছেন। এই গল্পগুলোতে লেখক মাঝে মাঝেই একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সদর্থক ভূমিকাও নিয়েছেন; সর্বক্ষেত্রেই শুধুমাত্র নির্বাক দর্শক হয়ে থাকেন নি।

সুবোধ ঘোষের এই ভূমিকা দেখে মনে হয়, তিনি যেন শুধুমাত্র একজন সাদাসিধে গল্প লিখিয়ে হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তিনি একজন মানুষ হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পাললেনর জন্য লেখকের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যিকদের 'ভালমানুষী' সম্পর্কে একটা অনীহা ও সুবোধের নিশ্চয়ই ছিল। এটা স্পষ্ট হয় 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের শেষ অনুচ্ছেদে লেখকদের সম্পর্কে সুবোধ ঘোষের করা একটি মন্তব্যে।

ভাগ্যিস বেলা জানে না যে প্রিয়তোষ লেখক মাত্র; মানুষ নয়। জীবনের আহ্বানের সম্মুখে যারা তাদের পৌরুষের ওপর ঘোমটা টেনে দিয়ে চুপি চুপি সরে পড়ে। ওরা শুধু লেখে – জীবন ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় বলেই ওরা লেখক।[২৭]

সুবোধবাবুর ছোটগল্পে কথনভঙ্গীর বৈচিত্রের অন্য একটি উদাহরণ তাঁর 'শুক্লা নবমী'। এক, দুই, তিন সংখ্যায় চিহ্নিত এবং তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, প্রায় ষোল পৃষ্ঠার এই গল্পটি ললিতার জবানীতে তারই অত্যন্ত করুণ এবং গৌরবোজ্জল দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা। গল্পটির কথনভঙ্গীর বিচিত্র বিষয় হলো, ললিতা একাই বক্তা। আর কোনো চরিত্র এ গল্পে সরাসরি কথা বলেনি। ললিতার স্বামী চারুবাবুর মুখে যে গুটিকয় বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, তাও ললিতার স্মৃতি থেকেই উদ্ধৃত। গল্পের কথনভঙ্গীর দৃষ্টিকোন থেকে 'শুক্লা নবমী'র এই অভিনবত্ব অস্বীকার করা চলে না।

কথনভঙ্গীর ক্ষেত্রে 'শুক্লা নবমী'র বিপরীত উদাহরণও সুবোধ ঘোষের গল্পে কম নেই। শুক্লা নবমীতে চরিত্রগুলোর কথোপকথন যেখানে প্রায় নেই বললেই চলে, সেখানে লেখকের বেশ কিছু গল্প আবার কথোপকথনেই ঠাসা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কথোপকথনও ঘটেছে অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যের ব্যবহারে। যেমন, স্নানযাত্রা গল্পে —

– একটা কথা মনে হচ্ছে
– বলুন
– মনে হচ্ছে, আপনার এখানে আর না থাকাই ভাল
– কেন ?
– এখানে আপনাকে মানায় না।
– ওদের সবাইকে বুঝি খুব মানায় ?
– না, সে কথা বলছি না। কাউকেই মানায় না।
তবে...মনে...হয়....আপনাকে একটুও মানায় না।
– কেন ?
– আপনাকে দেখে কে বলবে যে, আপনি এখানকার মানুষ।
– চিরকাল তো এখানকার মানুষ ছিলাম না।
– সে কথাই তো বলছি। ঘরে চলে যান।
– ঘরে ?
– হ্যাঁ।
– ঘর কোথায়, আমাকে ঘরে নেবে কে ?[২৮]

'নিমের মধু' গল্পটির সমাপ্তি রচনা করা হয়েছে, আরো ছোট ছোট বাক্যের কথপোকথনের মধ্য দিয়ে।

– চা খাবি ?
– না।
– কেমন দেখলি, বেশ বড়লোকের বাড়ি ?
– মোটেই না।
– কিছু হাতড়াতে পারলি ?
– কিচ্ছু না
– তাহলে স্রেফ..

— স্রেফ ঠকে এসেছি মাইরি।[২৯]

বেশ কয়টি ছোটগল্পে এ ধরণের কথোপকথনের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'অচিন রাখী', 'নিত সিঁদুর', পণরক্ষা ইত্যাদি। পণরক্ষার চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রায় সম্পূর্ণ অংশটি জুড়েই রয়েছে অলকা এবং দেবকীবাবুর কথপোকথন।

সুবোধ ঘোষের গল্পের অন্যতম আকর্ষণ তার তীব্র শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গোক্তি। যেখানে মানুষের প্রতি অত্যাচার হয়েছে, মনুষ্যত্বের অবমাননা হয়েছে, যেখানে মানুষ মেরুদন্ডহীনতায় ভুগেছে, সেখানেই তিনি বিদ্রুপ করে উঠেছেন তাঁর শাণিত ভাষায়। সুবোধ ঘোষ তাঁর বিদ্রুপ-বাণে কখনো বিদ্ধ করেছেন সভ্য শিক্ষিত মানুষের নারীদেহ লোলুপতাকে, কখনো ধর্মের ভন্ডামীর প্রতি শিক্ষিত মানুষের নি:সর্ত আত্মসমর্পণকে, কখনো বা শ্রমজীবী মানুষের প্রতি বিত্তবানদের সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারকে।

মানশুল্কা গল্পের ধর্ষিতা যুবতী আগো কলকাতা শহরের বুকে একটু আশ্রয়ের জন্য ঘুরে বেড়ায়। তার চারপাশে নারীমাংসলোভী পুরুষের ভিড়। আলোতে আতঙ্ক আগোর। কালো অন্ধকারেই সে তার রাতের আশ্রয় খোঁজে। আলোর এই অন্তরভাবনা নিয়ে প্রতিবেশ রচনা করেছেন লেখক —

> ইচ্ছে করে আগোর, মাঠের এই কিনারা থেকে, এই টিমটিমে কেরোসিনের আলোর ষড়যন্ত্র থেকে এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে মাঠের ভেতরে সত্যিকারের অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে; সারারাত দু'হাত দিয়ে প্রাণপন জোরে মাটি আঁকড়ে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে থাকতে, যেন পৃথিবীর কোন মাংসলোলুপ পৌরুষের জানোয়ার শত নির্মম চেষ্টা করেও তাকে টেনে তুলতে আর মেয়েলী শরীরটার সব গর্ব রূঢ় অপমানের আঘাতে চূর্ণ করতে না পারে।
>
> চরদিকে আলো নিববে কখন, আর শেয়াল ডাকবে কতক্ষণ পরে ? মাঠের ভেতরে ঘনতর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে আগো, আজ রাতের মত ঐখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারা যাবে বোধ হয়।[৩০]

হৃদঘনশ্যাম-এ আমরা দেখি একদা ঠগ শ্যামু, হৃদঘনশ্যাম নাম নিয়ে এক সাধুবাবাজী সেজে ভক্তপরিবৃত হয়ে আশ্রম চালাচ্ছেন। লেখক সুরেনদা, চরণডাক্তার এবং কুঞ্জবাবু আশ্রমে গিয়েছেন শ্যামুর এই ভন্ডামী ভেঙে দিতে। আশ্রমে হৃদঘনশ্যাম ওরফে বাবাজীকে দেখে লেখকের মনে হলো — 'শুঁয়োপোকা' ঠিক প্রজাপতি হয়নি, অজগর হয়েছে।' অথচ চরণডাক্তার সেই সাধুবেশী শ্যামুকে কুঞ্জবাবুর প্রণাম করাটা সমর্থন করে বসলেন। ভন্ডামীর কাছেও নিজের মেরুদন্ড সোজা রাখতে পারলেন না। লেখকের যুক্তিপূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিতে এটা ভক্তি নয়, বরং মেরুদন্ডহীনতা। চরণডাক্তারের মানস-পরিবর্তনের এই প্রকৃয়াকে ব্যঙ্গ করেছেন লেখক —

> চরণডাক্তারেরও মনের ভেতর অবিশ্বাসী ইঞ্জিনটার গর্জন যেন থেমে এসেছে। বোধহয় দম ফুরিয়ে এসেছে। তাই কোন মতে হাঁসফাঁস করে উত্তর দিলেন — তা প্রণাম করতে দোষ কি, বোধ হয় গায়ে পা ঠেকেছে।[৩১]

ফসিল গল্পের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ।

> সংক্রান্তির দিনে মহারাজা গায়ে আলপনা আঁকা হাতীর পিঠে চড়ে আর জুলুস নিয়ে পথে বার হন — প্রজাদের আশীর্বাদ করতে। তাঁর জন্মদিনে কেল্লার আঙিনায় রামলীলা গান হয় — প্রজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকোপ যা হয় — সব ব্যাপারেই লাঠি। যেখানে জনতা আর

জয়ধ্বনি, সেখানে লাঠি চলবেই আর দু'চারটে অভাগার মাথা ফাটাবেই।
চিঁড়ে আশীর্বাদ বা রামলীলা – সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয়;
প্রজারা সেই ভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।[৩২]

কাঞ্চনসংসর্গাৎ কে একটি ব্যঙ্গভিত্তিক গল্প বলা হলে অত্যুক্তি করা হবে না। এই গল্পে সুবোধবাবু সভ্য সমাজের কিছু অর্থপিশাচ মানুষের চিন্তা-ভাবনা, তাদের হাস্যকর মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভোগ-লালসার কদর্য রূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের হালকা চালে ফুটিয়ে তুলেছেন।

একদা কুলি-রিক্রুটার অটলবাবু সংসার ছেড়ে শুধুই রোজগার করেছেন। স্ত্রী-কন্যাদের সংসারের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন এমনকি স্ত্রীর অসুস্থাতার জন্য প্রতিবেশীরা তাকে ধরে নিয়ে এলেও স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য একটি কপর্দকও খরচ করেন নি। বিনা চিকিৎসায় স্ত্রীর মৃত্যুও তার অর্থোপার্জনের নেশায় কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে নি, বরং অটলনাথ নিরুপদ্রবে অর্থোপার্জনে মন দিলেন। তর তর করে এগিয়ে চললেন অটলনাথ। অঢেল উপার্যন। বদলে গেছেন অটলনাথ। সভা-সমিতিতে সর্বদাই তার ডাক পড়ে। কান্তিকুমারের লেখা ভাষন পাঠ করে অজস্র হাততালি কুড়োন তিনি। জীবনের প্রতিটি সুখ এবং সাফল্যকে অর্থের মাপকাঠিতেই বিচার করে অটলনাথ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সাহিত্যকে অর্থহীন মনে করে সে। কান্তিকুমারকে অটল জিজ্ঞাসা করে —

– বঙ্কিম কি রকম ইয়ে জমিয়েছিল, কিছু খবর রাখ মাস্টার ?
– বুঝলাম না স্যার
– ক্যাশ হে ক্যাশ, যাকে বলে নগদ নারায়ণ।
– আজ্ঞে না, সে খবর ঠিক জানি না।
– এগার লক্ষ তেত্রিশ হাজারের বেশি হবে কি ?
– এত নগদ টাকা কোথায় পাবেন বঙ্কিম চাটুজ্যে ?
– তাহলেই বোঝ মাস্টার ! এত বিদ্যে-সিদ্যে নামডাক পসার সব বৃথা হলো না কি ?[৩৩]

অটলনাথ সুরাপান নিবারণী সভার বার্ষিক বিবরণ পাঠ করে আবার সেই জয়নগরের ডিস্টিলারি ডেকে নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। যে অটলনাথ অর্থের মোহে স্ত্রীকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় সেই অটলের প্রাসাদের মত বাড়ির হলঘরে মৃতা স্ত্রীর অয়েল-পেন্টিং 'গজদন্তের ফ্রেমে' বাঁধানো হয়ে ঝুলে থাকে। সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য ঘরে অনেক বই রাখেন। তাই অটলনাথেরও একটি লাইব্রেরী রয়েছে। —'এক প্রশস্ত কক্ষে সারি সারি মেহগিনির আলমারি আর মরক্কো বাঁধাই বই'। অর্থগরিমায় অটলনাথ কখনো নিজের নামের আগে বাণিজ্যবীর বসায়, কখনো বা বাণিজ্য ঋষি। সবচেয়ে বড় ব্যঙ্গের বিষয়টি হলো, অটলনাথ কান্তিকুমারকে দিয়েই নিজের জীবনী লিখিয়ে নিচ্ছে। একটি ছত্রের এই ব্যঙ্গোক্তিটি দিয়েই লেখক গল্পটির সূচনা করেছেন। 'অটলনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী লিখবে কান্তিকুমার' !

তীব্র ব্যঙ্গাত্মক এই গল্পটি পুরোপুরি মেরুদন্ডহীন মধ্যবিত্তের আত্মসমর্পণের কাহিনী। গল্পের শুরুতে শিক্ষিত এবং সৎ কান্তিকুমার ব্যবসায়ী অটলনাথের তুলনায় অনেক উঁচু সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে কান্তিকুমার অটলনাথকে Dominate করেছে। কিন্তু ধাপে ধাপে অটলনাথের মুনাফা বেরেছে, কান্তিকুমারের প্রতিপত্তি কমেছে। ক্রমে অটলনাথই Dominate করেছে কান্তিকুমারকে। ব্যঙ্গের দ্যুতিতে লেখক দেখিয়েছেন বর্তমান সমাজে অর্থই শেষ কথা বলে। শিক্ষা নয়, রুচি নয়, সততা বা সংযম নয়। এই ব্যঙ্গ অর্থসর্বস্ব সমাজের প্রতি এক কশাঘাত। কাঞ্চন সংসর্গাৎ-এর ব্যঙ্গ প্রতিপন্ন করেছে—অর্থই

অনর্থের মূল কারণ।

পটভূমি রচনার ক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষের কৃতিত্ব সাহিত্য সমালোচকদের দ্বারা উচ্চ প্রসংশিত। তিনি সুনির্বাচিত শব্দ প্রয়োগে অনেক গল্পে এমন পটভূমি নির্মাণ করেছেন যার ফলে পাঠকের অন্তর্লোকে এক সুস্পষ্ট চিত্ররূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পটভূমি রচনায় সুবোধ ঘোষের এই অসামান্য দক্ষতার উল্লেখ করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —

> —বিষয়বৈচিত্র্য অপেক্ষা পটভূমিকা রচনায় লেখক উচ্চতর কৃতিত্বের অধিকারী। কোন বিশেষ ঘটনাপরিস্থিতি বা অন্তরের সূক্ষ্ম, অলক্ষ্যপ্রায় আবেগ ফুটাইয়া তুলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার সংক্ষিপ্ত, ব্যঞ্জনাগূঢ় বাক্যাবলী তীক্ষ্ণধার বর্ষাফলকের মত বর্ণিত বিষয়ের মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরতম রূপটি উদ্‌ঘাটিত করে। স্বল্প কয়েকটি সুনির্বাচিত রেখায়, অর্থভূয়িষ্ঠ সামান্য কয়েকটি মন্তব্যে পাঠকের সম্মুখে এক বর্নোজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া ওঠে, এক অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই Atmosphere বা অন্তরপ্রতিবেশ রচনায় লেখক অসাধারণ শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন।[৩৪]

ন তস্থৌ গল্পে, ২৬টি গ্রাম নিয়ে গঠিত কল্যাণঘাট মৌজা জরাজীর্ণ ও শ্রীহীণ। জমিদারীর অবস্থাও তাই। মৃতপ্রায় এ জমিদারীর জমিদার উপাধ্যায়ের বর্ননা দিয়ে পটভূমি রচনা করেছেন লেখক গল্পের শুরুতেই।

> ষাটের ওপর বয়স হয়েছে উপাধ্যায়ের। গায়ের শিরাগুলি যজ্ঞসূত্রের জালের মতো কাঁধ বুক পিঠ ও পেটের ওপর ছড়িয়ে থাকে। এককালের সুগৌর লম্বা শরীর এখন বেঁকে কুঁজো হয়ে গেছে। একটা চোখ ছানি। গলার চামড়াগুলি গল-কম্বলের মতো ঝোলে। গরদের ধুতি শক্ত গেরো দিয়ে কোমরে বাঁধা, উঠতে-বসতে তাল থাকে না, কাছা কোঁচা খুলে যায়। লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; দেখে মনে হয়, একটা নেড়া শ্বেতচন্দনের গাছ কাৎ হয়ে রয়েছে।[৩৫]

জমিদার উপাধ্যায়ের চেহারা ও স্বাস্থের এই বর্ণনার মধ্য দিয়েই পাঠক কল্যাণঘাট মৌজার প্রতিবেশ সম্পর্কে একটি সঠিক অনুমান করে নিতে পারেন। উপাধ্যায়ের জমিদারীতে গো-সম্পদের বর্ণনায় জমিদারীর অর্থনৈতিক অবস্থা স্পষ্টতর হয়ে ধরা পড়ে পাঠকের কাছে।

> বাথানে গোবর নেই। গরুগুলোর হাড় মোটা, পাছা সরু, সোজা শিং, পালান ছোট। খোল খড় জাউ পায় না। ক্ষিদের পেটে ওলের মুখী চিবোয়, শুয়ে শুয়ে ধোঁকে, আর জাবর কাটে। বাছুরের গা চাটে না, গুঁতিয়ে সরিয়ে দেয়। বাটে দুধ নেই, জোরে টানলে শিরা ফাটে, রক্ত ফোটে।[৩৬]

শিবালয় গল্পে লেখক গান্ধীজীর ডাকে অহিংস আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নিরস্ত্র মানুষের ওপর ইংরেজ শাসকের নির্লজ্জ্ব গুলিচালনার প্রাক্ মুহূর্তটির অন্তরপ্রতিবেশ রচনা করেছেন অসাধারণ কুশলতায়। প্রতিবেশ রচনার সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্কন করেছেন অন্য এক শ্রেণীর ভারতবাসীর কলঙ্কিত মুখ যারা ব্যক্তি স্বার্থেকে পরমার্থ জ্ঞান করে ইংরেজ প্রভুকে তুষ্ট করতে নিজ দেশবাসীর বিরুদ্ধে সদর্পে বন্দুক তুলে নেয়।

> সমস্ত কাছারি বাড়িটার পাগড়ী আর উর্দি গরম হয়ে উঠেছে। লাঠিধারী পুলিশেরা সার বেঁধে পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে যেন পাঁচিল টপকে কেউ ভিতরে ঢুকতে না পারে। ফটকের পথ রুখে প্রথম দফায় দাঁড়িয়ে ছিল একদল

গুর্খা সৈনিক, সঙ্গে একজন গোরা মেজর। টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র চটপট মোটর লরী দাবড়িয়ে চলে এসেছে। সদর থেকে এক রায় বাহাদুর এস-ডি-ও পত্রপাঠ চলে এসেছেন। ভুড়ির ওপর বেল্ট, বেল্টের সঙ্গে রিভলভার। ভুড়িতে যতই স্নেহ পদার্থ থাকুক রিভলভারটি একেবারে স্নেহবর্জিত। থানা-ইনচার্জ দারোগাবাবু হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছেন।

মাত্র তিনশত গ্রাম্য মানুষের একটা জনতা। কারো হাতে একটা লাঠিও নেই। মনের ভুলে লাঠি ছেড়ে দিয়েছে তা নয়, ইচ্ছে করেই ওরা আজ লাঠি ছোঁবে না। কারও মাথার খুলি ভাঙতে ওরা আসেনি।[৩৭]

আবার অতি সাধারণ এক রাত্রি শেষের বর্ণনায় শেষ প্রহর গল্পের পটভূমি রচনা করেছেন সুবোধ ঘোষ।

শেষ রাতের অন্ধকার যখন ফিকে হয়ে আসতে আরম্ভ করে, আর কদম গাছের মাথার উপর খড়-কুটোর নড়বড়ে বাসার ভিতরে ঘুমভাঙা দাঁড়কাকের ডানা ফরফর করে, ঠিক সেই সময় লেভেল ক্রসিং-এর নিঝুম তন্দ্রাও যেন হঠাৎ ভেঙে যায়। লেভেল ক্রসিং-এর চৌকিদার বুধন বারবার কাশে, গুমটির ভিতরে টুং টুং করে একটানা স্বরে একটা ঘন্টির মৃদু মুখরতা বাজতে থাকে। ঝন ঝন করে দুবার শব্দ হয়। লেভেল ক্রসিং-এর গেট বন্ধ করে দেয় বুধন।[৩৮]

তিন অধ্যায় গল্পের প্রধান চরিত্র অহিভূষণ মিউনিসিপ্যালটির চাকুরী করে। ঝাড়ুদার ও জমাদারদের কাজের তদারকি করতে গিয়ে মধ্যবিত্তের ঘৃণার পাত্র হয়। মধ্যবিত্ত তাকে গোত্রচ্যুত করে। অহিভূষণের কর্মস্থলের পরিবেশ বর্ণনায় শিল্পমন্ডিত হয়ে উঠেছে গল্পের পটভূমি।

লক্কড় সাইকেলটার পিঠে সওয়ার হয়ে মাইল দেড়েক দূরে শহরের বাইরে গিয়ে শ্মশানঘাটের সিঁড়িতে একবার দাঁড়ায়। ডোমটার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, মরা আর চিতার হিসাব নেয়। তারপরেই গিয়ে দাঁড়ায় খালের ধারে - ময়লা ময়দানের কাছে। দু'টো ইনসিনারেটারের চিমনি থেকে দগ্ধ পুরীষের দুর্গন্ধ ধূম বাতাস আচ্ছন্ন করে। অহির সাইকেলের শব্দে অলস গৃধিনীর দল আবর্জনার স্তূপের আড়ালে চমকে ওঠে, বড় বড় পাখা ছড়িয়ে আকাশে উঠে চক্কর দিয়ে উড়তে থাকে। অহি দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। উড়ন্ত গৃধিনীর পাখার চঞ্চল ছায়া আর শব্দের নীচে দাঁড়িয়ে এইখানে সূর্যাস্ত দেখে অহিভূষণ।[৩৯]

গল্পের এ সব পটভূমি পাঠকের অন্তরে এক স্পষ্ট চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলে। চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদারের বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্টতর হয়।

পাতার পর পাতা জুড়ে, গল্পের পর গল্পে, এমন সব বর্ণনা, এমন তার বাহার - যা শুধুমাত্র সাহিত্যের নিজস্ব সামগ্রী নয়। আঁকা হয়েছে ছবি - শব্দ দিয়ে। অক্ষর দিয়ে। এমন ছবি যা প্রায় আবিকৃতভাবেই সেরা সেরা চিত্রনাট্যে স্থান পেতে পারে। ছবির পরিচালককে শট্ ডিভিশন নিয়ে অযথা মাথার চুল ছিঁড়তে হয় না। এক মুহূর্ত চোখ বুঁজে ভেবে নিয়েই ক্যামেরাম্যান তার আলোর 'স্কীমিং' শুরু করে দিতে পারেন। এডিটর ইঙ্গিত পেয়ে যান – রি-রেকর্ডিং-এ বিভিন্ন চ্যানেলে শব্দগুলো কীভাবে বসাতে হবে।[৪০]

# নির্দেশিকা


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১। | সৈয়দ মুজতবা আলি | — | ভরা থাক | পৃ: ১৩৯-৪০ |
| ২। | অমিতাভ চৌধুরী | — | ভরা থাক | পৃ: ৫ |
| ৩। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড) | পৃ: ২৫৩ |
| ৪। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (পঞ্চম খন্ড) | পৃ: ১ |
| ৫। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) | পৃ: ১৮৯ |
| ৬। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (চতুর্থ খন্ড) | পৃ: ৮২ |
| ৭। | তদেব | — | | পৃ: ১১০ |
| ৮। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (পঞ্চম খন্ড) | পৃ: ৩১৪-৩১৫ |
| ৯। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) | পৃ: ১৬৩ |
| ১০। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (চতুর্থ খন্ড) | পৃ: ৫৫ |
| ১১। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) | পৃ: ৩২৬-৩২৭ |
| ১২। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (পঞ্চম খন্ড) | পৃ: ১০৯-১১০ |
| ১৩। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড) | পৃ: ২৫৯ |
| ১৪। | তদেব | — | | পৃ: ৩৫-৩৬ |
| ১৫। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (চতুর্থ খন্ড) | পৃ: ২৪৮ |
| ১৬। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) | পৃ: ১৭৩ |
| ১৭। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (পঞ্চম খন্ড) | পৃ: ১৫ |
| ১৮। | অরিন্দম গোস্বামী | — | সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য | পৃ: ১২২ |
| ১৯। | নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | — | ভরা থাক (সুবোধ ঘোষ, সুবোধদা) | পৃ: ৫৩ |
| ২০। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড) | পৃ: ৩৬ |
| ২১। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম খন্ড) | পৃ: ২২৮ |
| ২২। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) | পৃ: ৩২৬ |
| ২৩। | তদেব | — | | পৃ: ২৫৬ |
| ২৪। | নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | — | ভরা থাক (সুবোধ ঘোষ, সুবোধদা | পৃ: ৫৩ |
| ২৫। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষ প্রবন্ধাবলী (সম্পাদনা নিতাই বসু) | পৃ: ৭১ |
| ২৬। | প্রমথনাথ বিশী | — | ভরা থাক (ভাষার মৃদঙ্গ) | পৃ: ৬০-৬১ |
| ২৭। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (চতুর্থ খন্ড) | পৃ: ২৯৫ |
| ২৮। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) | পৃ: ২৪৭ |
| ২৯। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (পঞ্চম খন্ড) | পৃ: ১০৯ |
| ৩০। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম খন্ড) | পৃ: ১২৩-১২৪ |
| ৩১। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) | পৃ: ১৮৭ |
| ৩২। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড) | পৃ: ২৫ |
| ৩৩। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম খন্ড) | পৃ: ৮০ |
| ৩৪। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম খন্ড) | পৃ: ৮৯ |
| ৩৫। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড) | পৃ: ১ |
| ৩৬। | তদেব | — | | পৃ: ১ |
| ৩৭। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) | পৃ: ২৮৭ |
| ৩৮। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড) | পৃ: ৩৬-৩৭ |
| ৩৯। | সুবোধ ঘোষ | — | সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) | পৃ: ২-৩ |
| ৪০। | তরুণ মজুমদার | — | ভরা থাক (শব্দ থেকে ছবি) | পৃ: ৪৮ |